কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব। এগুলো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি। হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেনঃ যখন আমি কোন গোনাহ্ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেযাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে। মওলানা রূমী বলেনঃ

خلق را با تو چنیں بد خو کنند
تا ترا با چار رو آنسو کنند

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে তোমার উর্ধ্বতন শাসকবর্গ কিংবা অধঃস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে তোমাকে কষ্ট দায়ক কাজ-কারবারের বাহ্যিক আযাব দান করে প্রকৃতপক্ষে তোমার গতিধারা নিজের দিকে ফিরিয়ে দিতে চান---যাতে তুমি সতর্ক হয়ে স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে পরকালের বড় শাস্তি থেকে বেঁচে যাও।

মোট কথা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী শাসকবর্গের অত্যাচার ও নিপীড়ন উপর দিকের আযাব এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের বেঈমানী, কর্তব্যে অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতা নীচের দিকের আযাব। উভয়টিরই প্রতিকার এক। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম পর্যালোচনা করলে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা পরিহার করলে সর্বশক্তিমান এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবেন যাতে এ বিপদ দূর হয়ে যাবে। নতুবা শুধু বস্তুগত কলাকৌশল দ্বারা এগুলো সংশোধনের আশা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়। সর্বদাই এর অভিজ্ঞতা হচ্ছেঃ

خویش را دیدیم و رسوائی خویش
امتحانِ ما مکن اے شاہ بیش

উপর দিকের ও নীচের দিকের আযাবের যে বিভিন্ন তফসীর বর্ণিত হল প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত عذابا শব্দটি আসলে সবগুলো তফসীরকে পরিব্যাপ্ত করে। আকাশ থেকে বর্ষিত প্রস্তর, রক্ত, অগ্নি ও বন্যা এবং শাসকবর্গের অত্যাচার-নিপীড়ন---এগুলো সব উপর দিকের আযাবের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ভূ-পৃষ্ঠ দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাতে কোন সম্প্রদায়ের তলিয়ে যাওয়া কিংবা ভূ-গর্ভের পানি স্ফীত হয়ে তাতে নিমজ্জিত হওয়া কিংবা অধীনস্থ কর্মচারীদের হাতে বিপদে পতিত হওয়া ---এগুলো সব নীচের দিকের আযাবের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছেঃ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا—অর্থাৎ তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে এবং একদল অন্য দলের জন্য আযাব হয়ে যাবে। এতে يلبسكم শব্দটি لبس ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর

আসল অর্থ গোপন করা, আবৃত করা। এ অর্থেই لباس ঐ কাপড়কে বলা হয়, যা মানুষের দেহকে আবৃত করে এবং এ কারণেই التباس সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যেখানে কোন বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়।

شيع শব্দটি شيعة -এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ও অনুগামী। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ — অর্থাৎ নূহ (আ)-এর অনুসারী হলেন ইবরাহীম (আ)। সাধারণ প্রচলিত ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে شيعة শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্র হয় এবং এ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহায়ক হয়। অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পার্টি।

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে ঃ এক প্রকার আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন ঃ لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض — অর্থাৎ তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফির হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে। ---(মাযহারী)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত নামায পড়লাম। অনেকক্ষণ দোয়া করার পর তিনি বললেন ঃ আমি পালনকর্তার কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি ঃ এক. আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়া কবূল করেছেন। দুই. আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়াও কবূল করেছেন! তিন. আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।---(মাযহারী)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দেবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবূল হয়েছে। অপর দোয়া এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আগমন করবে না, কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ জন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন।

তিনি প্রতি ক্ষেত্রেই হুঁশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

সূরা হূদের এক আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ— অর্থাৎ তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।

এতে বোঝা গেল যে, যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।

এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না।

অন্য এক আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا অর্থাৎ যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না।

এসব আয়াত ও হাদীসের সারমর্ম এই যে, মতবিরোধ অত্যন্ত অশুভ ও নিন্দনীয় বিষয়। আজ জাগতিক ও ধর্মীয়, সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবনতি ও ধ্বংসের কারণ চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, তাদের অধিকাংশ বিপদাপদের কারণ পারস্পরিক মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা। আমাদের কুকর্মের পরিণতি হিসেবেই এ আযাব আমাদের উপর সওয়ার হয়ে গেছে। এ জাতির ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।' এ কালেমায় বিশ্বাসী পৃথিবীর যে কোন অংশে বসবাসকারী, যে কোন ভাষা-ভাষী, যে কোন বর্ণ ও বংশের সাথে সম্পর্কশীল, সবাই ছিল পরস্পরে ভাই ভাই। পাহাড় ও সমুদ্রের দুর্গম পথ তাদের ঐক্যে প্রতিবন্ধক ছিল না। বংশ, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য তাদের পথে বাধা ছিল না। তাদের জাতীয় ঐক্য এ কালেমার সাথেই জড়িত ছিল। আরবী, মিসরী, তুর্কী 'হিন্দী, চীনার বিভাগ ছিল শুধু পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য। মরহুম ইকবালের ভাষায় ঃ

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی
گھر اس کا نہ دہلی نہ صفاہان نہ سمرقند

আজ বিজাতির অশুভ চক্রান্ত ও অব্যাহত প্রচেষ্টা আবার তাদেরকে বংশ-ভাষা ও দেশভিত্তিক জাতীয়তায় বিভক্ত করে দিয়েছে। এর পর প্রত্যেক জাতি ও দল নিজেদের মধ্যেও অনৈক্য এবং বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং বিজাতিকেও ক্ষমার চোখে দেখা যে জাতির অঙ্গভূষণ ছিল, ঝগড়া-বিবাদ

থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে জাতি বৃহত্তম স্বার্থ থেকেও হাত গুটিয়ে নিত, আজ সেই জাতির অনেকেই সামান্য ও নিকৃষ্ট বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ঈমানের বৃহত্তম সম্পর্ককে বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত হয় না। হীন স্বার্থ ও বাসনার এ দ্বন্দ্বই জাতির জন্য অশুভ এবং দুনিয়াতে জঘন্য শাস্তিতে পরিণত হয়েছে।

হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বুঝে নেওয়া দরকার যে, যে মতবিরোধ মূলনীতি ও বিশ্বাস ক্ষেত্রে হয় কিংবা হীন স্বার্থ ও কুবাসনার কারণে হয় তাকেই কোরআন পাকে আল্লাহ্‌র আযাব ও আল্লাহ্‌র রহমতের পরিপন্থী বলা হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বর্ণিত ইজতিহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে শাখাগত মাস'আলাসমূহে প্রথম শতাব্দী থেকে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকহ্‌বিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ চলে এসেছে, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ মতবিরোধে উভয় পক্ষ কোরআন-সুন্নাহ্‌ ও ইজমা থেকে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে এবং প্রত্যেকের নিয়ত কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করা। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট শব্দের ব্যাখ্যায় এবং তদ্দ্বারা শাখাগত মাস'আলা বের করার কাজে ইজতিহাদ ও মতের বিরোধ দেখা দেয়। এ ধরনের মতবিরোধকে এক হাদীসে রহমত আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

জামে-সগীর গ্রন্থে নসর মুকাদ্দাসী (র), বায়হাকী (র) ও ইমামুল-হারামাইনের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, اختلاف امتى رحمة আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ। উম্মতে মুহাম্মদীর এ বৈশিষ্ট্যের কারণ এই যে, এ উম্মতের হক্কানী আলিম ও ফিকহ্‌বিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ হবে, তা সব সময় কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি অনুযায়ী হবে, সদুদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে হবে---জাঁকজমক ও অর্থোপার্জনের হীন স্বার্থ এ মতবিরোধকে উস্কানি দেবে না। ফলে তা যুদ্ধ-বিগ্রহেরও কারণ হবে না। বরং জামে-সগীরের টীকাকার আল্লামা আবদুর রউফ মানাভী (র)-র বিশ্লেষণ অনুযায়ী ফিকহ্‌-বিদদের বিভিন্ন মত ও পথ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের বিভিন্ন শরীয়তের অনুরূপ হবে। বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সবগুলো শরীয়ত ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলারই মনোনীত। এমনিভাবে মুজতা-হিদদের বিভিন্ন পথকে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি অনুযায়ী হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিধান বলা হবে।

এ ইজতিহাদী মতবিরোধের দৃষ্টান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মধ্যে ঠিক তেমন, যেমন শহরের প্রধান সড়কগুলোকে যাতায়াতকারীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। এক অংশে বাস চলে, অন্য অংশে অন্য গাড়ী কিংবা ট্রাম। এমনিভাবে সাইকেল আরোহী ও পথচারীদের জন্য পৃথক জায়গা থাকে, একই সড়ককে কয়েক ভাগে বিভক্ত করাও বাহ্যত একটি বিরোধের দৃশ্য। কিন্তু যেহেতু সবার গতি একই দিকে এবং প্রত্যেক ভাগের যাত্রী একই গন্তব্য স্থলে পৌঁছবে, তাই পথের এ বিরোধ ক্ষতিকর হওয়ার পরিবর্তে যাতায়াতকারীদের জন্য উপকারী ও রহমত স্বরূপ।

এ কারণেই মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহ্‌বিদরা এ বিষয়ে একমত যে, ফিকহ্‌বিদদের উদ্ভাবিত কোন পথই বাতিল নয়। যারা এসব পথ অনুসরণ করে অন্যদের পক্ষে

তাদেরকে গোনাহ্‌গার বলা বৈধ নয়। মুজতাহিদ ইমাম ও ফিকহ্‌বিদদের মাযহাবের যে বিভিন্নতা, এর সারকথা এর চাইতে বেশী কিছু নয় যে, একজন মুজতাহিদ যে পথ অবলম্বন করেছেন তা-ই তাঁর মতে প্রবল। কিন্তু এর বিপরীতে অন্য মুজতাহিদের পথকেও তিনি বাতিল বলেন না ; বরং একজন অপরজনের সম্মান করেন। সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহ্‌বিদ এবং ইমাম চতুষ্টয়ের অসংখ্য ঘটনা সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক মাস'আলায় ভিন্ন মাযহাব ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত আলোচনা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কলহ-বিবাদ, হিংসা ও শত্রুতার কোন আশংকাই সেখানে ছিল না। এসব মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যেও যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতা বিদ্যমান ছিল, তাঁদের পারস্পরিক ব্যবহারও এমনি ছিল।

এ মতবিরোধ হচ্ছে রহমতই রহমত। এটি সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং অনেক শুভ পরিণতির বাহক। বাস্তবে মাস'আলার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বর্ণনাকারী-দের মতবিরোধ সীমার ভিতরে থাকলে মোটেই ক্ষতিকর নয়, বরং মাস'আলার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলতে ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করে। সততাপরায়ণ বুদ্ধিজীবীরা একত্রে বসলে কোন মাস'আলাতেই মতবিরোধ হবে না---এটা অসম্ভব। বোধশক্তিহীন, নির্বোধ কিংবা অধর্মপরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেই এটা সম্ভব, যারা গোষ্ঠীগত স্বার্থের খাতিরে বিবে-কের বিরুদ্ধে ঐকমত্য প্রকাশ করে থাকে।

যে মতবিরোধ সীমার ভিতরে থাকে ( অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য ও বিশ্বাস-গত মাস'আলায় না হয়ে শাখাগত ইজতিহাদী মাস'আলায় হয়, যাতে কোরআন ও সুন্নাহ্‌ নীরব কিংবা অস্পষ্ট ) এবং বিবাদ-বিসম্বাদ ও ঝগড়াঝাটির কারণ না হয় তা ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী এবং নিয়ামত ও রহমত। উদাহরণত সৃষ্ট জগতের সব বস্তুর আকার-আকৃতি, রঙ, গন্ধ এবং বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা বিভিন্ন রূপ। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আছে। মানব জাতির মেজাজ, পেশা, কর্ম ও বসবাসের পদ্ধতিতে বিভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু সব বিভিন্নতা দুনিয়ার শ্রীবৃদ্ধিতে এবং অসংখ্য উপকারিতা সৃষ্টিতে সহায়ক।

অনেক লোক এ বাস্তব সত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা ফিকহ্‌বিদদের বিভিন্ন মাযহাব এবং আলিমদের বিভিন্ন ফতোয়াকেও ঘৃণার চোখে দেখে। তাদেরকে বলতে শোনা যায় যে, আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলে আমরা কোথায় যাব ? অথচ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। একজন রোগীর ব্যাপারেও চিকিৎসকদের মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় আমরা কি করি ? আমাদের ধারণায় যে চিকিৎসক অধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ, আমরা তাকেই চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করি এবং এজন্য ডাক্তারদের মন্দ বলি না। মোক-দ্দমার উকীলদের মধ্যেও মতের পার্থক্য দেখা দেয়। আমরা যে উকীলকে অধিক যোগ্য ও অভিজ্ঞ মনে করি, তার পরামর্শ মতই কাজ করি এবং অন্য উকীলদের কুৎসা গেয়ে ফিরি না। এ ক্ষেত্রেও এ নীতি অনুসরণ করা উচিত। কোন মাস'আলায় আলিমদের ফতোয়া বিভিন্ন রূপ হয়ে গেলে সাধ্যমত অনুসন্ধান করার পর যে আলিম জ্ঞান ও আল্লাহ্‌ ভীতিতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তাঁর ফতোয়া অনুসরণ করতে হবে, অন্য আলিমের কুৎসা প্রচার করা যাবে না।

হাফেয ইবনে কাইয়্যেম ( র ) 'এলামুল-মুকিয়ীন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ দক্ষ মুফতী

নির্বাচন এবং মতবিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতে অধিক জ্ঞানী ও আল্লাহ্ভীরু মুফতীর ফতোয়াকে অগ্রাধিকার দান---এ কাজ প্রত্যেক মাস'আলা প্রার্থী মুসলমানের একান্ত দায়িত্ব। আলিমদের অনেকগুলো ফতোয়ার মধ্য থেকে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া তার কাজ নয়, কিন্তু মুফতী ও আলিমদের মধ্যে যিনি তার মতে অধিক জ্ঞানী ও আল্লাহ্ভীরু তাঁর ফতোয়া মেনে চলা অবশ্যই তার কাজ, কিন্তু অপরাপর মুফতী ও আলিমের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে পারবে না। এ দায়িত্ব পালন করার পর সে আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। ফতোয়াদাতা কোন ভুল করে থাকলে, তজ্জন্য সে-ই দায়ী হবে।

মোট কথা এই যে, যে কোন মতবিরোধ সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও যে-কোন মতৈক্য সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় ও কাম্য নয়। যদি চোর, ডাকাত ও বিদ্রোহীরা একজোট হয়ে পরস্পরে একমত হয়ে যায়, তবে তাদের এ ঐকমত্য যে নিন্দনীয় ও জাতির পক্ষে মারাত্মক, তা কে না জানে। এ ঐক্যবদ্ধতার বিপক্ষে জনগণ ও পুলিশের পক্ষ থেকে যে কোন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তা নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ও উপকারী।

বোঝা গেল যে, মতবিরোধের মধ্যে এবং কোন এক মত মেনে চলার মধ্যে কোন অনিষ্ট নেই; বরং যতসব অনিষ্ট অন্যের সম্পর্কে কুধারণা ও কটূক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে। এটি জ্ঞানবুদ্ধি ও ধার্মিকতার দৈন্যদশা এবং কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার বাহুল্যের ফলশ্রুতি। কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ দোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তাদের জন্য রহমতের মতবিরোধও আযাবের মতবিরোধে পর্যবসিত হয়.এবং বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে মারামারি, হানাহানি এমন কি, খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা, কটূক্তি ও পীড়াদায়ক কথাবার্তাকে মাযহাবের পৃষ্ঠপোষকতা জ্ঞান করে। অথচ এ ধরনের বাড়াবাড়ির সাথে মাযহাবের কোন সম্পর্কই নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ জাতীয় কলহ-বিবাদে লিপ্ত হতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। সহীহ্ হাদীসসমূহে একে পথভ্রষ্টতার কারণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।--- (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বজন অর্থাৎ কোরায়শদের সত্য-বিরোধিতা উল্লেখ করে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আযাব কবে আসবে---তাদের এ প্রশ্নের জওয়াবে আপনি বলে দিন ঃ আমি এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নই। প্রত্যেক বিষয়ের একটি সময় আল্লাহ্র জ্ঞানে নির্ধারিত রয়েছে। সময় উপস্থিত হলে তা অবশ্যই হবে এবং এর ফলাফল তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن

شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ
لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ
بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ
تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ قُلْ
اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا
بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۡ
لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۭ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ
الْهُدٰى ۭ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاتَّقُوْهُ ۭ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۙ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۭ وَلَهُ
الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۭ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

(৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (৬৯) এদের যখন বিচার হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না; কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা—যাতে ওরা ভীত হয়। (৭০) তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমনভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা সমগ্র জগতকেও বিনিময়রূপে প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা নিজেদের কৃতকর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্য উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে—কুফরের কারণে। (৭১) আপনি বলে দিনঃ আমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহবান করব, যে

**আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না আর আমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরে যাব, এরপর যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন? ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে—সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে ঃ এস, আমাদের কাছে। আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি যাতে স্বীয় পালনকর্তার আজ্ঞাবহ হয়ে যাই। (৭২) এবং তা এই যে, নামায কায়েম কর ও তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে। (৭৩) তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন ঃ হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা আমার নিদর্শনাবলী (ও নির্দেশাবলী) সম্বন্ধে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তাদের (নিকট বসা) থেকে বিমুখ হও, যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয় এবং যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়, (অর্থাৎ এ ধরনের মজলিসে বসার নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকে) তবে (যখন স্মরণ হয়) স্মরণ হওয়ার পর আর অত্যাচারীদের সাথে উপবেশন করো না (তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কর) এবং (যদি এরূপ মজলিসে যাওয়ার কোন জাগতিক কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজন থাকে, তবে এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে,) যারা (বিনা প্রয়োজনে এরূপ মজলিসে যাওয়াসহ অন্যান্য শরীয়ত-নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে) সংযম অবলম্বন করে, তাদের উপর এদের (অর্থাৎ ভর্ৎসনাকারী মিথ্যারোপকারীদের) বিচারের (এবং ভর্ৎসনার গোনাহের) কোন প্রভাব পড়বে না (অর্থাৎ প্রয়োজনবশত এসব মজলিসে গমনকারীরা গোনাহ্‌গার হবে না)। কিন্তু তাদের দায়িত্ব (সামর্থ্য থাকলে) উপদেশ দান করা---সম্ভবত তারাও (অর্থাৎ ভর্ৎসনাকারীরাও এসব গর্হিত বিষয় থেকে) সংযম অবলম্বন করবে (ইসলাম গ্রহণ করে হোক কিংবা তাদের খাতিরে হোক) এবং (মিথ্যারোপের মজলিসেরই কোন বিশেষত্ব নেই, বরং) এরূপ লোকদেরকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর, যারা নিজেদের (এ) ধর্মকে (যা মেনে চলা তাদের দায়িত্বে ফরয ছিল, অর্থাৎ ইসলামকে) ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে) এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে (অর্থাৎ এর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আছে এবং পরকাল অবিশ্বাস করে। ফলে এ ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয়াবহ পরিণাম দৃষ্টি-গোচর হয় না) এবং (পরিত্যাগ করা ও সম্পর্কচ্ছেদ করার সাথে সাথে তাদেরকে) এ কোরআন দ্বারা (যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে) উপদেশও দান কর—যাতে কেউ স্বীয় কুকর্মের কারণে (আযাবে) এমনভাবে জড়িত না হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং অবস্থা এই হয় যে, যদি (ধরে নেওয়া যাক) সারা জগতকে বিনিময়রূপে প্রদান করে (যে, প্রতিদানে আযাব থেকে বেঁচে যাবে) তবুও তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না (কাজেই উপদেশে এ উপকার আছে যে, কুকর্মের পরিণাম সম্পর্কে

হুঁশিয়ার হতে পারে, পরে মান্য করা বা অমান্য করা তার কাজ, সেমতে ) তারা (বিদ্রূপকারীরা ) এমনই যে, ( উপদেশ মেনে নেয়নি এবং ) স্বীয় ( কু-) কর্মের কারণে ( আযাবে ) জড়িত হয়ে পড়েছে ( পরকালে এ আযাব এভাবে প্রকাশ পাবে যে, ) তাদের অত্যন্ত উত্তপ্ত ( ফুটন্ত ) পানি পান করতে হবে এবং ( এ ছাড়াও এবং এভাবেও ) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে স্বীয় কুফরের কারণে ( কেননা, আসল কুকর্ম এটাই, বিদ্রূপ ছিল এর একটি শাখা ) আপনি ( সব মুসলমানের পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে ) বলে দিন ঃ আমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত ( তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে ) এমন বস্তুর আরাধনা করব, যে ( আরাধনা করলে ) আমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ( আরাধনা না করলে ) আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না। ( অর্থাৎ উপকার ও ক্ষতি করার শক্তিই রাখেন না। আয়াতে মিথ্যা উপাস্য বোঝানো হয়েছে। তাদের কারও তো মূলতই শক্তি নেই এবং যাদের কিছু আছে, তাদেরও সত্তাগতভাবে নেই। অথচ যে উপাস্য হবে, তার মধ্যে কমপক্ষে মিত্র ও শত্রুর উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি থাকা উচিত। অতএব আমরা কি এমন বস্তুসমূহের আরাধনা করব ? ) এবং ( নাউযুবিল্লাহ্ ) আমরা কি ( ইসলাম থেকে ) পশ্চাৎপদে ফিরে যাব এর পর যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ( সৎ- ) পথপ্রদর্শন করেছেন ( অর্থাৎ প্রথমত, শিরক স্বয়ংই মন্দ, এরপর বিশেষত ইসলাম গ্রহণের পর তা আরও নিন্দনীয়। নতুবা আমাদের এমন দৃষ্টান্ত হবে ) যেমন কোন ব্যক্তিকে শয়তান কোন বনভূমিতে বিভ্রান্ত করে বিপথগামী করে দিয়েছে এবং সে উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে ( এবং ) তার কিছু সহচরও ছিল, যারা তাকে ঠিক পথের দিকে ( ডেকে ডেকে ) আহ্বান করছে যে, ( এদিকে ) আমাদের কাছে এস ( কিন্তু সে চরম হতবুদ্ধিতার কারণে বুঝেও না এবং আসেও না। মোট কথা এ সেই ব্যক্তি যে ঠিক পথে ছিল, কিন্তু জঙ্গলের ভূতের হাতে পতিত হয়ে বিপথগামী হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গীরা এখনও তাকে পথে আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে আসছে না,---আমাদের অবস্থাও তেমনি হয়ে যাবে। আমরাও ইসলামের পথ থেকে অর্থাৎ পথপ্রদর্শক পয়গম্বর থেকে পৃথক হয়ে যাব এবং পথভ্রষ্টকারীদের কবলে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এরপরও পথপ্রদর্শক পয়গম্বর শুভেচ্ছাবশত আমাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে থাকবেন, কিন্তু আমরা পথভ্রষ্টতা পরিত্যাগ করব না। অর্থাৎ তোমাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করে আমরা কি নিজেদের জন্য এমন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করব ? ) আপনি ( তাদের ) বলে দিন ঃ ( যখন এ দৃষ্টান্ত থেকে জানা গেল যে, পথ থেকে বিপথগামী হওয়া মন্দ এবং এটা ) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্র ( প্রদর্শিত ) পথই সুপথ ( এবং তা হচ্ছে ইসলাম। অতএব ইসলামকে ত্যাগ করাই বিপথগামী হওয়া। সুতরাং আমরা তা কিরূপে ত্যাগ করতে পারি ? ) এবং ( আপনি বলে দিন যে, আমরা শিরক কিরূপে করতে পারি ) আমাদের ( তো ) আদেশ করা হয়েছে যেন আমরা স্বীয় পালনকর্তার পুরোপুরি আনুগত্যশীল হয়ে যাই ( যা ইসলামেই সীমাবদ্ধ ) এবং এই ( আদেশ করা হয়েছে ) যে, নামায প্রতিষ্ঠিত কর ( যা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার স্পষ্টতম লক্ষণ ) এবং ( আদেশ করা হয়েছে যে, ) তাঁকে ( অর্থাৎ আল্লাহ্কে ) ভয় কর ( অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণ করো না। শিরক হচ্ছে সর্ববৃহৎ বিরুদ্ধাচরণ। ) এবং তাঁরই ( আল্লাহরই ) দিকে তোমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন ( কবর থেকে বের করে ) একত্র করা হবে। ( সেখানে মুশরিকদের শিরকের ফল ভোগ করতে হবে ) এবং তিনিই ( আল্লাহ্ তা'আলাই ) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ( এতে প্রধান ফায়দা এই যে, এ দ্বারা

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয়। সুতরাং এটিও একত্ববাদের একটি প্রমাণ।) এবং ( পূর্বে تحشرون বলে হাশর অর্থাৎ কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। একেও অসম্ভব মনে করো না। কেননা, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে তা এত সহজ যে ) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা বলে দেবেন ( হাশর ) তুই হয়ে যা, ব্যাস তা ( হাশর তৎক্ষণাৎ ) হয়ে যাবে। তাঁর ( এ ) কথা ক্রিয়াশীল ( ব্যর্থ হয় না ) এবং হাশরের দিন যখন শিঙ্গায় ( আল্লাহ্‌র আদেশে দ্বিতীয়বার ফেরেশতার ) ফুঁৎকার করা হবে, তখন সকল আধিপত্য ( সত্যিকার-ভাবেও, বাহ্যতও ) বিশেষ করে তাঁরই ( আল্লাহ্ তা'আলারই ) হবে ( এবং তিনি স্বীয় আধিপত্যের বলে একত্ববাদী ও অংশীবাদীদের ফয়সালা করবেন ) তিনি ( আল্লাহ্ ) অদৃশ্য বিষয় ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত ( সুতরাং মুশরিকদের কর্ম এবং অবস্থাও তাঁর জানা আছে ) এবং তিনিই প্রজ্ঞাময় ( তাই প্রত্যেককেই উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন এবং তিনিই ) সর্বজ্ঞ ( কাজেই তাঁর কাছ থেকে কোন কিছু গোপন করা সম্ভব নয় )।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

**বাতিলপন্থীদেব সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ঃ** উল্লেখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গোনাহ্, সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গোনাহ্। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর বিবরণ এরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে يخوضون শব্দটি خ و ض থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خوض বলা হয়। কোরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণত এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। كُنَّا نَخُوضُ مَعَ

فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। الْخَائِضِينَ এবং

তাই خوض فى الايات -এর অনুবাদ এ স্থলে 'ছিদ্রান্বেষণ' ( অর্থাৎ দোষ খোঁজাখুঁজি করা ) কিংবা 'কলহ করা'---করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী করীম (সা)-ও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদের শোনানোর জন্য। নতুবা তিনি এর আগে কখনও এরূপ মজলিসে যোগদান করেন নি। কাজেই কোন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না।

অতঃপর মিথ্যাপন্থীদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কয়েক প্রকারে হতে

পারে ঃ এক. মজলিস ত্যাগ করা, দুই. সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া---তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে প্রথম প্রকারই বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ মজলিসে বসা যাবে না সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল---নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহ্‌র আয়াত ও রসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ---উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ্‌। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী তফসীরে কবীর-এ বলেন ঃ এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোনাহ্‌র মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জানমাল কিংবা ইজ্জতের আশংকা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয। উদাহরণত অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক---ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়---তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ ----অর্থাৎ 'যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়।' এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোন আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের মুদ্রাদোষ। কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্‌র রসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে?

উত্তর এই যে, বিশেষ কোন তাৎপর্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীরাও (আ) ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেওয়া হতো। ফলে তাঁরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না ; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোট কথা, আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ رفع عن امتى الخطاء وما استكرهوا عليه ---অর্থাৎ আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গোনাহ্‌ এবং যে কাজ অপরে জোর-জবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গোনাহ্‌ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাসসাস (র) আহকামুল-কোরআনে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা

যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হ্যাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নেই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাসসাস (র) মাস'আলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ্; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও জুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ---অর্থাৎ অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে-কিরাম (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে তবে আমরা মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে (এটি মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেওয়া। সম্ভবত দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا—এখানে ذر শব্দটি ذرء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কোন কিছুকে পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই ঃ আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে ঃ এক. তাদের জন্য সত্যধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। দুই. তারা আসল

ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

এর পর বলা হয়েছে ঃ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا — অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনও এসব কাণ্ড করত না।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দু'টি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ এক. উল্লেখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরী।

আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে أَنْ تُبْسَلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া।

কোন ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। প্রথমত স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকরী হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ أُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ -

অর্থাৎ "এরা ঐ লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক। তাদের সংসর্গে ওঠা-বসাকারীও পরিণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে।

উল্লিখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি যে কোন মানুষের জন্যই বিষতুল্য। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমত বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গোনাহ্ করে, তখন তার মানসপটে একটি কাল দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কাল দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সে-ও গোনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোনাহ্ করে চলে এবং অতীত গোনাহের জন্য তওবা করে না, তখন একের পর এক কাল দাগ পড়তে থাকে, এমনকি, নূরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ভালমন্দের পার্থক্য থাকে না। কোরআন পাকে رَانَ শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ কুকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে।

চিন্তা করলে বোঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌঁছায়। نعوذ بالله منهم এ কারণেই অভিভাবকদের কর্তব্য ছেলেপুলেদেরকে এ ধরনের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

পরবর্তী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল সপ্রমাণের বিষয়-বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বোঝা যায়।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ
وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ
الْاٰفِلِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ
لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۝ فَلَمَّا
رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ
يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ
فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَحَآجَّهٗ
قَوْمُهٗ ۚ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۚ وَلَآ اَخَافُ مَا
تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ
اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ فَاَيُّ
الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

(৭৪) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আ) পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত। (৭৫) আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম—যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৭৬) অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল ঃ আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। (৭৭) অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল ঃ যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৭৮) অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। (৭৯) আমি

**একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই। (৮০) তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল ঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ ; অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না—তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তা প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? (৮১) যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আর সে সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে ( যারা এ বিশ্বাসে তোমার সাথে শরীক ) প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখছি। [ তারকাদের সম্পর্কে কথোপকথন পরে বর্ণিত হবে। মাঝখানে পূর্বাপর সম্বন্ধ থাকার কারণে ইবরাহীম (আ)-এর সুস্থ চিন্তা দ্বারা বিশেষিত হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করা হচ্ছে ] এবং আমি এরূপ ( পরিপূর্ণ ) ভাবেই ইবরাহীম (আ)-কে নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তুসমূহ ( তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে ) প্রদর্শন করিয়েছি যাতে সে ( স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে ) জ্ঞানী হয়ে যায় এবং যাতে ( তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির ফলে ) নিশ্চিত বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ( অতঃপর বিতর্কের পরিশিষ্টে তারকাদের সম্পর্কে কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ইতিপূর্বে প্রতিমাদের সম্পর্কে কথোপকথন শেষ হয়েছে---) অনন্তর ( সেইদিন কিংবা অন্য কোন দিন ) যখন রজনীর অন্ধকার তাঁর উপর ( এমনিভাবে অন্য সবার উপরও ) সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা নিরীক্ষণ করল ( যে, ঝিকিমিকি করছে ) সে ( স্বজাতিকে সম্বোধন করে ) বলল ঃ ( তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ) এটি আমার ( ও তোমাদের ) পালনকর্তা ( এবং আমার অবস্থার পরিচালক। খুব ভাল ; অল্পক্ষণের মধ্যেই আসল স্বরূপ জানা যাবে। সেমতে অল্পক্ষণ পর তারকাটি দিগন্তে অস্তমিত হল। ) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল ঃ আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। ( ভালবাসা পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করার অপরিহার্য পরিণতি। সুতরাং সার কথা এই যে, আমি এটাকে পালনকর্তা মনে করি না। ) অতঃপর ( সে রাত্রিতেই কিংবা অন্য কোন রাত্রিতে ) যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে ( উদিত হতে ) দেখল, তখন ( পূর্বের ন্যায়ই ) বলল ঃ এটি আমার ( ও তোমাদের ) পালনকর্তা ( এবং অবস্থার উত্তম পরিচালক, এবার অল্পক্ষণের মধ্যে এর দশাও দেখে নাও। সেমতে চন্দ্রও অস্তমিত হয়ে গেল। ) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল ঃ যদি আমার ( সত্যিকার ) পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকেন, ( যেমন এ পর্যন্ত করে এসেছেন ) তবে আমিও ( তোমাদের ন্যায় ) বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর ( অর্থাৎ চাঁদের

ঘটনা তারকার ঘটনার রাত্রিতে হলে কোন এক রাত্রির প্রত্যূষে, আর যদি চাঁদের ঘটনা তারকার ঘটনার রাত্রিতে না হয়, তবে চাঁদের ঘটনার রাত্রির প্রত্যূষে কিংবা এছাড়া অন্য কোন রাত্রির প্রত্যূষে ) যখন সূর্যকে ( খুব চাকচিক্য সহকারে ) ঝলমল করতে করতে উদিত হতে দেখল, তখন ( প্রথমোক্ত দু'বারের মতই আবার ) বলল ঃ ( তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ) এটি আমার ( ও তোমাদের ) প্রভু ( এবং অবস্থার পরিচালক এবং ) এটি তো সবগুলোর ( উল্লিখিত তারকাসমূহের ) মধ্যে বৃহত্তর। ( এতেই আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এহেন পালন কর্তাও যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে ছোটদের তো কথাই নেই। মোট কথা, দিনের শেষে সূর্যও মুখ লুকাল।) অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত ( এবং তৎপ্রতি ঘৃণা পোষণ ! অর্থাৎ বিমুক্ততা প্রকাশ করছি ; বিশ্বাসগতভাবে তো সদা সর্বদা মুক্তই ছিলাম।) আমি ( সব তরীকা থেকে ) একমুখী হয়ে স্বীয় ( বাহ্যিক ও আন্তরিক ) আনন ঐ সত্তার প্রতি ( আকৃষ্ট করে তোমাদের কাছে প্রকাশ ) করছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি ( তোমাদের ন্যায়) অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত নই। ( বিশ্বাস, উক্তি ও কর্ম কোন দিক দিয়েই না )। অতঃপর তার সাথে তার সম্প্রদায় [ অনর্থক ) বিতর্ক করতে লাগল ( তারা বলতে লাগল ঃ এটা প্রাচীন প্রথা وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ অর্থাৎ বাপদাদা চৌদ্দপুরুষকে এদের আরাধনা করতে দেখেছি। মিথ্যা উপাস্যদেরকে অস্বীকার করার কারণে তারা তাঁকে একথা বলে ভীতিপ্রদর্শনও করল যে, এরা তোমাকে বিপদে জড়িত করে দিতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জওয়াব ... ... وَلَآ اَخَافُ দ্বারা একথা বোঝা যায়। ] সে ( প্রথম কথার উত্তরে ) বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ( অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ববাদ ) সম্পর্কে আমার সাথে ( মিথ্যা ) বিতর্ক করছ ? অথচ তিনি আমাকে ( বিশুদ্ধ প্রমাণের মাধ্যমে ) পথপ্রদর্শন করেছেন যা আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত করেছি। ( শুধু প্রাচীন প্রথা হওয়াই এ প্রমাণের জওয়াব হতে পারে না। সুতরাং এ কথা বলে দাবী সপ্রমাণ করা তোমাদের পক্ষে ফলদায়ক নয় এবং আমার পক্ষে ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয় ) আর ( দ্বিতীয় কথার উত্তরে বললেন ঃ ) তোমরা যেসব বিষয়কে ( আরাধনার যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অংশীদার স্থির করে রেখেছ, আমি তাদেরকে ভয় করি না (যে তারা আমাকে কোন কষ্ট দিতে পারে। কেননা তাদের মধ্যে 'কুদরত' তথা শক্তিই নেই। কারও মধ্যে থাকলেও শক্তির স্বাতন্ত্র্য নেই ) কিন্তু আমার পালনকর্তা যদি কিছু ইচ্ছা করেন, ( তবে তা ভিন্ন কথা— তা হয়ে যাবে, কিন্তু এতে মিথ্যা উপাস্যদের শক্তি কিভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাদেরকে ভয় করারই বা কি প্রয়োজন পড়ে ? এবং ) আমার পালনকর্তা ( যেমন সর্বশক্তিমান ঃ উপরোক্ত বিষয়াদি থেকে তা জানা গেছে, তেমনি তিনি ) প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের ( অর্থাৎ জ্ঞান-সীমার ) মধ্যে বেষ্টন ( ও) করে আছেন। ( মোট কথা শক্তি ও জ্ঞান তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তোমাদের উপাস্যদের শক্তিও নেই, জ্ঞানও নেই ) তোমরা ( শোন এবং ) তবুও কি চিন্তা কর না ? ( এবং আমার ভয় না করার কারণ যেমন এই যে, তোমাদের উপাস্যরা জ্ঞান ও শক্তির ব্যাপারে শূন্যগর্ভ, তেমনি এ কারণও তো আছে যে, আমি কোন ভয়ের কাজ করিওনি।

এমতাবস্থায়) আমি এগুলোকে কেন ভয় করব, যাদেরকে তোমরা ( আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আরাধনার যোগ্য হওয়া এবং পালকত্বের বিশ্বাসে ) অংশী স্থির করেছ, অথচ ( তোমাদের ভয় করা উচিত, দু কারণে ঃ এক. তোমরা ভয়ের কাজ অর্থাৎ শিরক করেছ, যা শাস্তিযোগ্য। দুই. আল্লাহ্ তা'আলা যে সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, তা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু ) তোমরা এ বিষয়ে ( অর্থাৎ এ বিষয়ের শাস্তিকে ) ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করেছ, যাদের ( উপাস্য হওয়া ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি কোন ( শব্দগত কিংবা অর্থগত ) প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। উদ্দেশ্য এই যে, ভয় করা উচিত তোমাদের ; কিন্তু উল্টো আমাকে ভয় দেখাচ্ছ---) অতএব ( এ বিবৃতির পরে চিন্তা করে বল, উল্লিখিত উভয় দলের মধ্যে ) শান্তি লাভের ( অর্থাৎ ভয়-ভীতিতে পতিত না হওয়ার ) অধিক যোগ্য কে? ( এবং ভয়ও তা, যা বাস্তবে ধর্তব্য অর্থাৎ পরকালের ) যদি তোমরা ( কিছু ) জ্ঞান রাখ।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষ থেকে মুশরিকদের সম্বোধন এবং প্রতিমা পূজা ছেড়ে আল্লাহ্র আরাধনার আহবান বর্ণিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহবানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গিতে স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম ( আ)-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমা ও তারকা-পূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম 'আযর'---এ কথাই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী (র) এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলিম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে যান। চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা বলা হয়েছে। যারকানী (র) 'মাওয়াহিব' গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

**বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহবান ঃ** আযর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা হোন কিংবা চাচা---সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও অনুরূপ

নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঃ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্য পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করেন।

তফসীরে বাহরে-মুহীত-এ বলা হয়েছে ঃ এতে বোঝা যায় যে, পরিবারের কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে, তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহবান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবী তা-ই। আরও জানা গেল যে, সত্য প্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকট-আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গম্বদের সুন্নত।

**দ্বিজাতি তত্ত্ব ঃ** এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেনঃ তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত রয়েছে। মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশ-গত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীতে সব জাতীয়তাই বর্জনীয়।

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد
فدائے یک تن بیگانه کاشنا باشد

কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তাঁর পদাংক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ -

অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদের পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন খাড়া থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে সমবেত না হও।

বলা বাহুল্য---এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাম্মদী ও অন্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে

এ জাতীয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজ্জের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোন্ জাতীয় লোক? উত্তর হল ঃ نَحْنُ قَوْمٌ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমরা মুসলমান জাতি। (বুখারী) এতে ঐ সত্যিকার ও কাল-জয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আ) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদের পিতার দিকে সম্বন্ধ করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন ঃ يَا قَوْمِ اِنِّىْ بَرِيْئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ—অর্থাৎ হে আমার কওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এখানে এই ইঙ্গিতই করা হয়েছে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরিকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কছেদ করতে বাধ্য করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বজনরা ও তাঁর পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও। এ কারণেই ইবরাহীম (আ) এ দুটি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজাও পথভ্রষ্টতা। পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ -

অর্থাৎ আমি ইবরাহীম (আ)-কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তুসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সে সব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا - قَالَ هٰذَا رَبِّىْ—অর্থাৎ এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হল এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন ঃ এ নক্ষত্র আমার পালনকর্তা। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে।

কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইবরাহীম (আ) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেনঃ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ—آفِلِينَ-শব্দটি أفول থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অস্ত যাওয়া।

উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্তু আল্লাহ্ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত। মাওলানা রুমী নিম্নলিখিত কবিতায় এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

خلیل آسا در ملک یقین زن
نوائے لا احب الآفلین زن

এরপর অন্য কোন রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় স্বজনদেরকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেনঃ (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকতেন তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন সত্তা, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয়।

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেনঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতিসত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেনঃ

يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ—অর্থাৎ হে আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থ অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'আল্লাহ্য়ে ওয়াহদাহু লাশারীকেল্ল' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ) পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথম-বারেই তাদের নক্ষত্র-পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেন নি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে। তবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথম-বারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র-পূজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না।

নক্ষত্র-পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়---অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়াকে এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা, এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গম্বররা সাধারণত সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তাঁরা দার্শনিকসুলভ তাত্ত্বিক আলোচনার পেছনে বেশী পড়েন না ; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।

**প্রচারকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ ঃ** হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকগণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে ইবরাহীম (আ) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা, এর ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু নক্ষত্র-পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন নি, বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা, নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাদের ক্ষমতাহীনতার মত সুস্পষ্ট নয়। এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি এমন কোন ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে আলিম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে ইবরাহীম (আ) জাতিকে একথা বলেন নি যে, তোমরা এরূপ কর ; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্তুকে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন

সত্তার দিকে ফিরিয়েছি, যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। উদ্দেশ্য তাই ছিল যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত থাকেন—যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা, সত্যকথা বলে দেওয়াই সংস্কারক ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকরী ভঙ্গীতে বলা জরুরী।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم
مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مَّن نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا
هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ
وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَ
لُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي
بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ
فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

(৮২) যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। (৮৩) এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (৮৪) আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি—তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদকে, সোলায়মানকে, আইউবকে, ইউসুফকে, মূসাকে ও হারূনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) আরও যাকারিয়াকে, ইয়াহ্ইয়াকে, ঈসাকে এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৬) এবং ইসমাঈলকে, ইয়াসা'কে, ইউনুসকে, লূতকে—প্রত্যেককেই আমি সারা

**বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। (৮৭) আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভাইদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। (৮৮) এটি আল্লাহ্‌র হিদায়ত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথে চালান! যদি তারা শির্‌ক করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত। (৮৯) তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুয়ত দান করেছি। অতএব যদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্য এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

যারা (আল্লাহ্‌র প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই (কিয়ামতে) শান্তি এবং তারাই (দুনিয়াতে) সুপথগামী। (এরা হচ্ছে একমাত্র একত্ববাদীর দল---অংশীবাদীরা নয়। অংশীবাদীরা কোন-না-কোন সত্তাকে উপাস্য হিসাবে মান্য করে, এদিক বিবেচনায় যদিও আভিধানিক অর্থে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু শিরকও করে। ফলে তাদের বিশ্বাস শরীয়তসম্মত নয়। একত্ব-বাদীরাই যখন শান্তি লাভের যোগ্য, তখন স্বয়ং তোমাদের ভয় করা উচিত। অনন্তর আমাকে তাদের সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা অনুচিত। কেননা, তোমাদের উপাস্যরা ভয়ের যোগ্য নয়; আমিও কোন ভয়ের কাজ করিনি এবং দুনিয়ার ভয় ধর্তব্যও নয়। তোমাদের অবস্থা এ তিন দিক থেকেই ভীতিজনক) এবং এটি [অর্থাৎ এ যুক্তি যা ইবরাহীম (আ) একত্ব-বাদ সপ্রমাণ করার জন্য কায়েম করেছিলেন] আমার (প্রদত্ত) যুক্তি ছিল, যা আমি ইবরাহীম (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। [যখন আমার প্রদত্ত ছিল তখন অবশ্যই উচ্চস্তরের ছিল। ইবরাহীম (আ)-এর-ই কি বিশেষত্ব] আমি (তো) যাকে ইচ্ছা, (জ্ঞানগত ও কর্মগত) মর্যাদায় সমুন্নত করি। (সেমতে সব পয়গম্বরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (অর্থাৎ প্রত্যেকের অবস্থা ও যোগ্যতা জানেন এবং প্রত্যেককেই তার উপযুক্ত পরাকাষ্ঠা দান করেন) এবং [আমি ইবরাহীম (আ)-কে যেমন জ্ঞান ও কর্মের ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা দান করেছি তেমনি আপেক্ষিক পরা-কাষ্ঠাও প্রদান করেছি; অর্থাৎ তাঁর ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন পুরুষদের মধ্যে অনেককেই পরাকাষ্ঠা দান করেছি। সেমতে] আমি তাঁকে (এক পুত্র) ইসহাক দান করেছি এবং (এক পৌত্র) ইয়াকুব দান করেছি। (এতে অন্য সন্তান নেই বোঝা যায় না এবং উভয় জনের মধ্যে) প্রত্যেককেই আমি (সৎ) পথ প্রদর্শন করেছি এবং ইবরাহীমের পূর্বে আমি নূহ্ (আ)-কে [যার সম্পর্কে খ্যাত আছে যে, তিনি ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরুষ এবং পূর্বপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অধঃস্তন পুরুষের মধ্যেও ক্রিয়াশীল থাকে, সৎ] পথ-প্রদর্শন করেছি এবং তাঁর [ইবরাহীম (আ)-এর আভিধানিক, প্রচলিত কিংবা শরীয়তগত] সন্তানদের মধ্যে (শেষ পর্যন্ত যারা উল্লিখিত হয়েছেন সবাইকে সৎ পথ-প্রদর্শন করেছি অর্থাৎ) দাউদ (আ)-কে এবং (তাঁর পুত্র) সোলায়মান (আ)-কে এবং আইউব (আ)-কে এবং ইউসুফ (আ)-কে এবং মূসা (আ)-কে এবং হারূন (আ)-কে (সৎপথ প্রদর্শন করেছি,) এবং (যখন তারা

সৎপথে চলেছেন, তখন আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদানও দিয়েছি---যেমন সওয়াব ও অধিক নৈকট্য। আমি সৎকাজের জন্য যেমন তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছি, ) তেমনিভাবে ( আমার চিরন্তন রীতি এই যে, ) আমি সৎকর্মীদেরকে ( উপযুক্ত ) প্রতিদান দিয়ে থাকি এবং আরও ( আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি, ) যাকারিয়া (আ)-কে এবং ( তাঁর পুত্র ) ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে ( এবং এরা ) সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আরও ( আমি সৎপথ প্রদর্শন করেছি ) ইসমাঈল (আ)-কে এবং ইয়াসা (আ)-কে এবং ইউনুস (আ)-কে এবং লুত (আ)-কে এবং ( তাদের মধ্যে ) প্রত্যেককেই ( তৎকালীন ) সারা বিশ্বের উপর ( নবুয়ত দ্বারা ) গৌরবান্বিত করেছি এবং আরও তাদের ( উল্লিখিতদের ) কিছুসংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে ( সৎপথ প্রদর্শন করেছি ) এবং আমি তাদের ( সকল )-কে সরল পথ ( অর্থাৎ সত্য ধর্ম ) প্রদর্শন করেছি, ( যে ধর্ম তাদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছিল, ) আল্লাহ্র ( পক্ষ থেকে যা ) সুপথ ( হয়ে থাকে ) তা এই ( ধর্ম )। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথ প্রদর্শন ( অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার ব্যবস্থা ) করেন ( বর্তমানে যারা আছে তাদেরকেও এই অর্থে এ পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যে পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ; গন্তব্যস্থলে পৌঁছা না পৌঁছা তাদের কাজ ; কিন্তু তাদের কেউ কেউ এ পথ পরিত্যাগ করে শিরক অবলম্বন করেছে ) এবং ( শিরক এতদূর ঘৃণিত যে, যারা পয়গম্বর নয়, তাদের তো কথাই নেই ) যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তারা ( উল্লিখিত পয়গম্বররা ) ও ( নাউযুবিল্লাহ্ ) শিরক করতেন, তবে তারা যা কিছু ( সৎ ) কর্ম করতেন, তাদের জন্য সব ব্যর্থ হয়ে যেত। ( পরের আয়াতে নবুয়তের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ) এরা ( যারা উল্লিখিত হয়েছেন ) এমন ছিলেন যে, আমি তাদের ( সমষ্টি )-কে ( ঐশী ) গ্রন্থ, হিকমত এবং নবুয়ত দান করেছিলাম। ( কাজেই নবুয়ত কোন অভিনব বিষয় নয় যে, মক্কার কাফিররা আপনাকে অস্বীকার করবে। কেননা, এর অনেক নযীর আছে। অতএব যদি ( নযীর থাকা সত্ত্বেও ) তারা ( আপনার ) নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে ( আপনি দুঃখিত হবেন না, কেননা ) আমি তার ( অর্থাৎ স্বীকার করার ) জন্য এমন সম্প্রদায় স্থির করেছি ( অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার ) যারা এতে অবিশ্বাস করবে না।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বীয় পিতা ও নমরূদের সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রতিমাপূজা ও নক্ষত্রপূজার বিরুদ্ধে নিশ্চিত সাক্ষ্য-প্রমাণ বর্ণনা করার পর তিনি স্বজাতিকে বলেছিলেন ঃ তোমরা আমাকে ভীতি প্রদর্শন করছ যে, প্রতিমাদেরকে অস্বীকার করলে তারা আমাকে ধ্বংস করে দেবে। অথচ প্রতিমাদের ভয় করা উচিত নয়। কেননা, তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুকে বরং সৃষ্ট বস্তুর হাতে তৈরী প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করে কঠোর অপরাধ করেছ। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা যে সর্বজ্ঞ ও শক্তিমান, তাও কোন বুদ্ধিমানের অজানা নয়। এমতাবস্থায় তোমরাই বল, শান্তি লাভের যোগ্য কারা এবং কাদের ভয় করা উচিত ?

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ শান্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ জুলুমকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে-কিরাম চমকে উঠেন এবং আরয করেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন জুলুম করেনি? এ আয়াতে শান্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে জুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? মহানবী (সা) উত্তরে বললেন ঃ তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'জুলুম' বলে শিরককে বোঝানো হয়েছে। দেখ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন ঃ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

( নিশ্চয় শিরক বিরাট জুলুম )। কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শান্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

মোট কথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা করে তারা নির্বুদ্ধিতাবশত এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোন ক্ষতি করে ফেলবে---এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের নিগূঢ় কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ভালমন্দ সবকিছু করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে---অথচ এ ভয় তো তোমরা কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই---তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর ---এটা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি? একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন বিপদাশংকা নেই।

এ আয়াতে وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ-বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র ব্যাখ্যা অনুযায়ী জুলুমের অর্থ শিরক---সাধারণ গোনাহ্‌ নয়। কিন্তু ظلم শব্দটি نكرة ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ যাবতীয় শিরকই এর অন্তর্ভুক্ত। يلبسوا শব্দটি لبس থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার শিরক মিশ্রিত করে; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলাকে তাঁর যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যকে কোন কোন ঐশী গুণের বাহক মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শিরক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরিক, যে কোন প্রতিমার পূজাপাঠ করে না এবং ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করে, কিন্তু কোন ফেরেশতা কিংবা রসূল কিংবা ওলীকে আল্লাহ্‌র কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে

এবং তাদের মাযারকে 'মনোবান্ছা পূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যত মনে করে যে, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে, আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ نعوذ بالله منه

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ স্বজাতির বিরুদ্ধে বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ) যে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেছেন এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দিয়েছেন, এটা ছিল আমারই অবদান। আমিই তাঁকে বিশুদ্ধ মতবাদ দান করেছি এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বলে দিয়েছি। কেউ যেন স্বীকার, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাগ্মিতার জন্য গর্বিত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কারও নৌকা তীরে ভিড়ে না। নিছক মানববুদ্ধিই সত্যোপলব্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। যুগে যুগেই দেখা যাচ্ছে যে, বড় বড় সুনিপুণ দার্শনিক পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক অশিক্ষিত মূর্খ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও মতবাদের অনুসারী হয়। মওলানা রূমী (র) চমৎকার বলেছেন ঃ

بے عنایاتِ حق وخاصانِ حق
گر ملک باشد سیہ ہستش ورق

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ — অর্থাৎ আমি যার ইচ্ছা মর্যাদা সমুন্নত করে দিই। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) সারা বিশ্বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যে সম্মানের আসন লাভ করেছেন, ইহুদী, খৃস্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবাই যে তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাও আমারই দান। এতে কারও স্বকীয়তার প্রভাব নেই।

এরপর ছয়টি আয়াতে সতের জন পয়গম্বরের তালিকা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরুষ, অধিকাংশই তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং কেউ কেউ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র। এসব আয়াতে একদিকে তাঁদের সুপথ প্রাপ্ত হওয়া, পুণ্যবান হওয়া এবং সরল পথে থাকার কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলাই ধর্মের কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। অপরদিকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় পিতা, স্বদেশ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালের উচ্চ মর্তবা ও চিরস্থায়ী শান্তির পূর্বে দুনিয়াতেও তাঁকে উত্তম স্বজন এবং উত্তম দেশ দান করেছেন। কেননা, তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত যত নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন, সবাই তাঁরই সন্তান-সন্ততি ছিলেন। হযরত ইসহাক (আ) থেকে যে শাখা বের হয়, তাতে বনী ইসরাঈলের সব পয়গম্বর রয়েছেন এবং দ্বিতীয় যে শাখা হযরত ইসমাইল (আ) থেকে বের হয়, তাতে সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, নবিয়্যুল আম্বিয়া, খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সবাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। এতে আরও জানা গেল যে সম্মান, অপমান এবং মুক্তি ও শাস্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই ক্রিয়া-কর্মের

উপর নির্ভরশীল, কিন্তু পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোন নবী বা ওলী থাকা সন্তান-সন্ততির মধ্যে কোন আলিম এবং পুণ্যবান থাকাও একটি বড় নিয়ামত। এর দ্বারাও মানুষের উপকার হয়।

আয়াতে উল্লিখিত সতের জন পয়গম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তান-সন্ততি। বলা হয়েছে ঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ..... — এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান অর্থাৎ পৌত্র নন—দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায়? অধিকাংশ আলিম ও ফিকহ্‌বিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذريت শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হোসাইন (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশধরভুক্ত।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আ) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতৃব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপর দিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা। সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ (সা)-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

অষ্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে মহানবী (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ আপনার কিছু সংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী (সা)-র আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশংসার স্থলে তাঁদের উল্লেখ করেছেন। اللهم اجعلنا منهم واحشرنا فى زمرتهم

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا
أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ
مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ
كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ
اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا
أَيْدِيهِمْ ۚ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ
كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ
مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

(৯০) এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ মাত্র। (৯১) তারা আল্লাহ্কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি যখন তারা বলল ঃ আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেন নি। আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল ? যা জ্যোতি বিশেষ এবং মানবমণ্ডলীর জন্য হিদায়ত স্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্ত-পত্রে রেখে লোকদের জন্য প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে

**এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানত না। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। (৯২) এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি ; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তী-দেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে। (৯৩) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে ঃ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালিমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে বের কর স্বীয় আত্মা। অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে ! কারণ তোমরা আল্লাহ্র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে। (৯৪) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ যেরূপ আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

( আমি যে দুঃখিত না হওয়ার এবং ধৈর্য ধারণ করার কথা বলি, এর কারণ এই যে, সব পয়গম্বর তাই করেছেন। সেমতে উল্লিখিত ) এরা এমন ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ( এ ধৈর্যের ) পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব ( এ ব্যাপারে ) আপনিও তাদের ( ধৈর্যের ) পথ অনুসরণ করুন। ( যেহেতু আপনাকেও এ বিষয়বস্তুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেননা, তাদের সাথে আপনার কোন লাভ-লোকসান জড়িত নেই যে, আপনি দুঃখিত ও অধৈর্য হবেন, তাই এ বিষয়বস্তু প্রকাশ করার জন্য প্রচার কার্যের সময় ) আপনি ( এ কথাও ) বলে দিন যে, আমি তোমাদের কাছে এর ( অর্থাৎ কোরআন প্রচারের ) জন্য কোন বিনিময় চাই না ( যা পেলে লাভ এবং না পেলে ক্ষতি হয়---আমি নিঃস্বার্থ উপদেশ দিই )। এ ( কোরআন ) তো শুধু সারা বিশ্বের জন্য একটি উপদেশ ( যা পালন করলে তোমাদের উপকার এবং পালন না করলে তোমাদেরই ক্ষতি ) এবং তারা ( অবিশ্বাসকারীরা ) আল্লাহ্ তা'আলাকে যথার্থ সম্মানে সম্মা-নিত করেনি, যখন তারা ( গাল ভরে ) বলে দিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু ( অর্থাৎ কোন গ্রন্থ ) এখনও অবতীর্ণ করেন নি। ( এরূপ উক্তি করা অকৃতজ্ঞতা। কেননা এ থেকে নবুয়তের প্রশ্নটি অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি নবুয়ত অস্বীকার করে সে আল্লাহ্কে মিথ্যারোপ করে, অথচ আল্লাহ্কে সত্য জ্ঞান করা ফরয। সুতরাং উপরোক্ত উক্তি দ্বারা ফরয কৃতজ্ঞতায় ত্রুটি করা হয়। এ হচ্ছে তথ্য ভিত্তিক উত্তর। পরবর্তী বাক্যে জব্দ করার জন্য বলা হচ্ছে---) আপনি ( তাদেরকে ) বলুন ঃ ( বল তো ) ঐ গ্রন্থ কে অবতীর্ণ করেছে, যা মূসা (আ) আনয়ন করেছিলেন ( অর্থাৎ তওরাত, যাকে তোমরাও মান্য কর ) যার

অবস্থা এই যে, তা ( স্বয়ং ) জ্যোতি ( সদৃশ সুস্পষ্ট ) এবং ( যাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য এসে-ছিল, সেই ) মানব-মণ্ডলীর জন্য ( শরীয়ত বর্ণনা করার কারণে ) উপদেশস্বরূপ---যাকে তোমরা ( হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ) বিক্ষিপ্ত পত্রে রেখে দিয়েছ, যা ( অর্থাৎ যতটুকু পত্র ইচ্ছা ) প্রকাশ করছ ( অর্থাৎ যাতে তোমাদের স্বার্থবিরোধী কোন কথা নেই ) এবং বহুলাংশকে ( অর্থাৎ যেসব পত্রে স্বার্থবিরোধী কথা লিপিবদ্ধ আছে সেগুলোকে ) গোপন করছ ? ( এ গ্রন্থের মাধ্যমে ) তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষাদান করা হয়েছে, যা ( গ্রন্থ প্রাপ্তির পূর্বে ) তোমরা ( অর্থাৎ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেসব বনী ইসরাঈল বিদ্যমান ছিলে ) জানতে না এবং তোমাদের ( নিকটবর্তী ) পূর্ব পুরুষরা জানত না। [ উদ্দেশ্য এই যে, যে তওরাতকে প্রথমত তোমরা মান্য কর, দ্বিতীয়ত জ্যোতি ও হিদায়ত হওয়ার কারণে যা মান্য করার যোগ্য, তৃতীয়ত যা সর্বদা তোমাদের ব্যবহারে আছে, যদিও ব্যবহারটি লজ্জাজনক---কিন্তু এর কারণে অস্বীকার করার অবকাশ তো নেই এবং চতুর্থত তোমাদের পক্ষে তা খুব বড় নিয়ামত এবং অনুগ্রহের সামগ্রী, যার দৌলতে তোমরা আলিম হয়েছ, এ দিক দিয়েও একে অস্বীকার করার জো নেই। এখন বল, এ গ্রন্থটি কে অবতীর্ণ করেছে ? এ প্রশ্নের উত্তর সুনির্দিষ্ট। কারণ, তারাও অন্য কোন উত্তর দিত না, তাই স্বয়ং মহানবী (সা)-কে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে---] আপনি ( তাই ) বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ( উল্লিখিত গ্রন্থ ) অবতীর্ণ করেছেন। ( এতে তাদের ব্যাপক দাবী বাতিল হয়ে গেল। ) অতঃপর ( এ উত্তর শুনিয়ে ) তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। ( অর্থাৎ আপনার কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেছে।---না মানলে আপনি চিন্তিত হবেন না, আমি নিজেই বুঝে নেব। ) এবং ( তওরাত যেমন আমার অবতীর্ণ গ্রন্থ, তেমনিভাবে ) এ ( কোরআন )-ও ( যাকে অসত্য প্রমাণ করা ইহুদীদের উপরোক্ত উক্তির আসল উদ্দেশ্য---) এমন গ্রন্থ, যাকে আমি ( আপনার প্রতি ) অবতীর্ণ করেছি, যা ( কল্যাণ ও ) বরকত বিশিষ্ট। ( সেমতে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও মেনে চলা ইহকাল ও পরকালে সাফল্যের কারণ এবং ) পূর্ববর্তী ( অবতীর্ণ ) গ্রন্থসমূহের ( আল্লাহ্র গ্রন্থ হওয়ার ) সত্যতা প্রমাণকারী। ( অতএব, আমি এ কোরআন সৃষ্ট জীবের উপকার ও আল্লাহ্র গ্রন্থসমূহের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অবতীর্ণ করেছি। ) এবং ( এ কারণে অবতীর্ণ করেছি যে, ) যাতে আপনি ( এর মাধ্যমে ) মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদের ( বিশেষভাবে আল্লাহ্র শাস্তির ) ভয় প্রদর্শন করেন ( যার বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং ব্যাপক ভয়ও প্রদর্শন করেন যে, لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا এবং ( আপনার ভয় প্রদর্শনের পর যদিও সবাই বিশ্বাস স্থাপন না করে, কিন্তু ) যারা পরকালে ( পূর্ণ ) বিশ্বাস রাখে ( যদ্দ্বারা শাস্তির শংকা হয়, তা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা জাগে এবং সর্বদা ঐতিহাসিক কিংবা যৌক্তিক যে কোন প্রমাণের মাধ্যমে সত্য নির্ধারণ ও মুক্তির পথ অন্বেষণে ব্যাপৃত হয় ) তারা তো এর ( অর্থাৎ কোরআনের ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ( ই ) এবং ( বিশ্বাসের সাথে সাথে এর কাজকর্মও যথারীতি সম্পাদন করে। কেননা, বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ের উপর পূর্ণ মুক্তির ওয়াদা নির্ভরশীল। সেমতে ) তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে। ( যা দৈনিক পাঁচবার করা হয়। এমন কঠিন ইবাদতই যখন তারা সংরক্ষণ করে, তখন অন্য সহজ ইবাদত যা মাঝে মাঝে করতে হয়, তা অবশ্যই পালন করবে। মোট কথা, কেউ মানুক বা না মানুক---আপনি

তজ্জন্য চিন্তিত হবেন না। যারা নিজের মঙ্গল চাইবে, তারা মানবে---যারা চাইবে না, তারা মানবে না। আপনি নিজের কাজ করুন )। এবং ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ ( আরোপ ) করে ( এবং সাধারণ নবুয়ত কিংবা বিশেষ নবুয়ত অস্বীকার করে; যেমন পূর্বে কারও কারও উক্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ এবং কেউ কেউ বলত ঃ أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ) কিংবা দাবী করে যে, আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার কাছে কোন কিছুর ওহী আসেনি ( যেমন, মুসায়লামা প্রমুখ )। এবং ( এমনভাবে তার চাইতে বড় জালিম কে ) যে দাবী করে যে, যেরূপ কালাম আল্লাহ্‌ তা'আলা [ রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাবী অনুযায়ী ] নাযিল করেছেন, এমনি কালাম আমিও অবতীর্ণ করে ( দেখিয়ে ) দিই। ( যেমন, নযর প্রমুখ বলত। মোট-কথা, এরা সবাই বড় জালিম।) আর ( জালিমদের অবস্থা এই যে,) যদি আপনি ( তাদেরকে) তখন দেখেন ( তবে ভয়ংকর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে ) যখন [ উল্লিখিত জালিমরা মৃত্যুর ( আত্মিক ) যন্ত্রণায় ( নিপতিত ) হবে এবং ( মৃত্যুর ) ফেরেশতারা ( যারা মালাকুল মওতের সহকর্মী---তাদের আত্মা বের করার জন্য তাদের দিকে ) স্বীয় হস্ত ( প্রসারিত করে ) বলে যাবে ( যে, ) হ্যাঁ, ( শীঘ্র ) তোমাদের আত্মা বের কর ( কোথায় ) লুকিয়ে ফিরতে---দেখ ) আজ ( মৃত্যুর সাথেই ) তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। ( অর্থাৎ সে শাস্তিতে শারীরিক কষ্ট ও আত্মিক অবমাননা---দুইই আছে। ) কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা বলতে ( যেমন سَأُنْزِلُ এবং أُوْحِيَ إِلَيَّ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ইত্যাদি। ) এবং তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহ থেকে ( যা হিদায়তের উপায় ছিল, মেনে নেওয়ার ব্যাপারে ) অহংকার করতে ( এ অবস্থা হবে মৃত্যুর সময় ) এবং ( কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন ঃ ) তোমরা আমার কাছে ( বন্ধু ও সাহায্যকারী ) থেকে নিঃসঙ্গ ( হয়ে ) এসেছ ( এবং এমনভাবে এসেছ ) যেমন আমি প্রথমবার ( জগতে ) তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। ( অর্থাৎ দেহে বস্ত্র ছিল না এবং পায়ে জুতা ছিল না ) এবং আমি তোমাদের যা ( দুনিয়াতে সাজ-সরঞ্জাম ) দিয়েছিলাম, ( যে কারণে তোমরা আমাকে ভুলে গিয়েছিলে ) তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ ( সাথে কিছুই আনতে পারলে না। উদ্দেশ্য এই যে, পার্থিব ধন-সম্পদের ভরসা করো না। এগুলো এখানেই থেকে যাবে। ) এবং ( তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীয় মিথ্যা উপাস্যদের সুপারিশের ভরসা করত। অতএব ) আমি তোমাদের সাথে ( এক্ষণে ) তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবেও তারা তোমাদের সাথে নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে ( আমার ) অংশী-দার। ( অর্থাৎ আরাধনার ব্যাপারে তোমরা আমার সাথে যে ব্যবহার করতে, তাদের সাথে তাই করতে। ) বাস্তবিকই তোমরা ( এবং তাদের ) পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ( অর্থাৎ আজ তোমরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তারা তোমাদের প্রতি। এমতাবস্থায় কি

সুপারিশ করবে ) এবং তোমাদের ( উল্লিখিত ) সব দাবী অতীতে বিলীন হয়ে গেছে, ( কোন কাজেই আসেনি ! কাজেই এখন বিপদের অন্ত থাকবে না )।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট অবদান এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদা উল্লিখিত হয়েছিল। এতে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতিকে এবং বিশেষভাবে মক্কা ও আরববাসীদের কার্যত একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তু বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে আসল প্রতিদান তো কিয়ামতের পর জান্নাতেই পাবে, কিন্তু দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন মর্তবা ও ধন-সম্পদ দান করেন, যার সামনে দুনিয়ার সব ধন-সম্পদ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ) পিতা-মাতা, দেশ ও জাতি সবই আল্লাহ্র উদ্দেশে বিসর্জন দেন। অতঃপর খানায়ে-কা'বা নির্মাণের মহান কাজের জন্য সিরিয়ার তৃণ সজ্জিত শস্য-শ্যামল ভূমি পরিত্যাগ করে মক্কার বালুকাময় ধূসর মরু-ভূমিতে বসতি স্থাপন করেন। স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিজনভূমিতে ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হলে অনতিবিলম্বে তা পালন করেন। একমাত্র আদরের পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া হলে যথাসাধ্য তা পালন করে দেখান।

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র জন্য স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আম্বিয়া (আ)-র একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহ্র ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল কুরা অর্থাৎ মক্কা লাভ করেন। তাঁর জাতি তাঁকে লাঞ্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানবজাতির ইমাম ও নেতারূপে বরিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত।

এ ক্ষেত্রে সতের জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশই ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে দীনের খিদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসী-দের শোনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃ-পুরুষ হওয়ার কারণেই অনু-সরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনু-সরণ করা হবে সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আম্বিয়া (আ)-র একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ — অর্থাৎ

এরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন ঃ

فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ —অর্থাৎ আপনিও তাদের হিদায়ত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন।

এতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে ঃ এক. আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের পদাংক অনুসরণ কর।

দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের পন্থা অবলম্বন করুন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আম্বিয়া (আ)-র শরীয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তাঁদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় মহানবী (সা)-কে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের অর্থ কি? দ্বিতীয় আয়াতের মর্ম এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে, এখানে সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধানে পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, বরং দীনের মূলনীতি একত্ববাদ, রিসালত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। এগুলো কোন পয়গম্বরের শরীয়তেই পরিবর্তিত হয়নি। আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন।—(মাযহারী ইত্যাদি)

এরপর মহানবী (সা)-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বররাও করেছেন। ঘোষণাটি এই ঃ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ هُوَ

اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ০ অর্থাৎ আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নেই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা। শিক্ষা ও প্রচার কার্যের জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্বরের অভিন্ন নীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যারা বলেছিল আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কখনও কোন গ্রন্থ অবতীর্ণই করেন নি, গ্রন্থ ও রসূল প্রেরণ ব্যাপারটি মূলত ভিত্তিহীন।

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তি পূজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য তফসীরকারের মতে এটি ইহুদীদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যত এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থী ছিল। ইমাম বগভী (র)-র এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিল এবং তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছেন ঃ যারা এমন বাজে কথা বলেছে তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে চেনে নি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হত না। যারা সর্বাবস্থায় ঐশী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির একজন হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছ, সে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিন ঃ তোমরা এমন বক্রগামী যে, যে তওরাতকে তোমরা ঐশী গ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদীরা সেগুলো তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষে تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। قراطيس শব্দটি قرطاس-এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ—অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তওরাত ও ইঞ্জীলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে; আপনিই বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا -

অর্থাৎ তওরাত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কোরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কোরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তওরাত ও ইঞ্জীলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্য দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বনী ইসরাঈলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী-ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল-কুরা অর্থাৎ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন বিশেষ পয়গম্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কোরআন বিশেষভাবে তাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মোয়াযযমাকে কোরআন পাক 'উম্মুল-কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কিবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু।—( মাযহারী )

উম্মুল-কুরার পর وَمَنْ حَوْلَهَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

অর্থাৎ যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা, মেনে নেওয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা—এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌ভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায় পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ

থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কোরআন পাকের কোন সূরা বরং কোন রুকূ এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ
الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

**(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। ইনিই আল্লাহ্, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৯৬) তিনি প্রভাত-রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন—যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। (৯৮) আর তিনিই তোমাদের একমাত্র জীবসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা, স্থিতি ও গচ্ছিত হওয়ার স্থল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা চিন্তা করে।**

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী (অর্থাৎ মৃত্তিকায় পোতার পর তিনিই বীজ ও আঁটিকে অঙ্কুরিত করেন।) তিনি জীবিত (বস্তু)-কে মৃত (বস্তু) থেকে বের করেন (যেমন, বীর্য থেকে মানুষ জন্মগ্রহণ করে।) এবং তিনি মৃত (বস্তু)-কে জীবিত (বস্তু) থেকে বের করেন। (যেমন মানুষের দেহ থেকে বীর্য প্রকাশ পায়।) ইনিই আল্লাহ্! (যার এমন শক্তি)। অতঃপর তোমরা (তাঁর আরাধনা ছেড়ে) কোথায় (অন্যের আরাধনার দিকে) উল্টো চলে যাচ্ছ? তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি থেকে) প্রভাতের উন্মেষক (অর্থাৎ রাত্রি শেষ হয় এবং প্রভাত ফুটে ওঠে।) এবং তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন (অর্থাৎ সব শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ রাত্রিতে নিদ্রা যায় এবং আরাম লাভ করে)। আর সূর্য ও চন্দ্রকে (অর্থাৎ এদের গতিকে) হিসাবের জন্য রেখেছেন (অর্থাৎ এদের গতি বিধিবদ্ধ। ফলে

সময় নিরূপণ করা সহজ হয়)। এটি (অর্থাৎ এদের গতি বিধিবদ্ধ হওয়া) ঐ সত্তার নির্ধারণ, যিনি (সর্ব) শক্তিমান, (এরূপ গতিশীলতা সৃষ্টি করার শক্তি তাঁর আছে এবং) জ্ঞানময় (এ গতিশীলতার উপযোগিতা ও রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন। তাই এ বিশেষ ভঙ্গিতে সৃজন করেছেন) এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের (উপকারের) জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন। (উপকার এই যে) যাতে এদের দ্বারা (রাত্রির) অন্ধকারে---স্থলে এবং জলেও পথপ্রাপ্ত হও। নিশ্চয় আমি (এসব একত্ববাদ ও নিয়ামত দানের) প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। যদিও সবার কাছেই তা পৌঁছাবে; কিন্তু উপকারী) তাদের জন্য (-ই হবে) যারা (ভালমন্দের কিছু খবর রাখে। কেননা, এরাই চিন্তা-ভাবনা করে।) এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের (সবাই)-কে এক ব্যক্তি [অর্থাৎ আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর পরবর্তীতে বংশবৃদ্ধির পরম্পরা এভাবে চলে এসেছে যে, তোমাদের প্রত্যেককে ধাতুর স্তরে] এক জায়গায় বেশীদিন অবস্থানের (অর্থাৎ জননীর গর্ভাশয়) এবং এক জায়গায় অল্পদিন অবস্থানের (অর্থাৎ পিতার মেরুদণ্ড) لقوله تعالى من بين الصلب নিশ্চয় আমি (একত্ববাদ ও নিয়ামতদানের এসব) প্রমাণাদি (ও) খুব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, (কিন্তু এর উপকারও পূর্বের ন্যায়) তাদের জন্য (-ই হবে,) যারা বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী। (এ হচ্ছে------ يخرج الحى বাক্যের বিশদ বর্ণনা)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা বর্ণিত হয়েছিল। এসব দোষের আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাই আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এ রোগের প্রতিকারার্থ স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী। এতে আল্লাহ্র শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেওয়া একমাত্র জগৎ স্রষ্টারই কাজ---এতে কোন মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ্র শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অংকুর গজিয়ে ওঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশী কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের

অঙ্কুরোদ্‌গম হওয়া, অতঃপর তাতে রঙ-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরী করতে অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানবীয় কর্মের কোন প্রভাব নেই। তাই কোর-আনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ

অর্থাৎ তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না, যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, না আমি করি?

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে ঃ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেন, বীর্য ও ডিম---এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন---যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেন ঃ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ---অর্থাৎ এগুলো সবই এক আল্লাহ্‌র কাজ। অতঃপর একথা জেনেশুনে তোমরা কোন্ দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ---فالق শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং اصباح শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। فالق الا صباح এর অর্থ প্রভা-তকে ফাঁককারী ; অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জীন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তি ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষু-ষ্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জীন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোন সৃষ্ট জীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ।

**রাত্রিকে সৃষ্ট জীবের আরামের জন্য প্রাকৃতিক ও বাধ্যতামূলক নির্ধারণ একটি বিরাট নিয়ামত ঃ** এর পর বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا---سكن শব্দটি

থেকে উদ্ভূত। যেখানে পৌঁছে মানুষ শান্তি, স্বস্তি ও আরাম লাভ করে, তাকেই سكن বলা হয়। একারণেই মানুষের বাসগৃহকে কোরআনে سكن বলা হয়েছে ঃ جَعَلَ

لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا কেননা কুঁড়ে ঘর হলেও মানুষ সেখানে পৌঁছে স্বভাবতই স্বস্তি ও আরাম বোধ করে। কাজেই আলোচ্য বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রিকে প্রত্যেক প্রাণীর জন্য আরামদায়ক করেছেন। فَالِقُ الْإِصْبَاحِ বাক্যে ঐসব নিয়ামতের বর্ণনা ছিল, যা মানুষ দিবালোকে অর্জন করে---রাত্রির অন্ধকারে নয়। এরপর جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ দিনের বেলা সব কাজ-কারবার করে বিধায় দিবালোক যেমন একটি বিরাট নিয়ামত, তেমনি রাত্রির অন্ধকারকেও মন্দ মনে করো না। এটিও একটি বড় নিয়ামত। রাত্রে সারাদিনের শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ আরাম করে পরদিন আবার নবোদ্যমে কাজ করার যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা মানবপ্রকৃতি অব্যাহত পরিশ্রম সহ্য করতে পারত না।

রাত্রির অন্ধকারকে আরামের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া একটি স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং আল্লাহ্ তা'আলার অজেয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এ নিয়ামতটি প্রত্যহ অযাচিতভাবে পাওয়া যায়। তাই এটি যে কত বিরাট নিয়ামত ও অনুগ্রহ, সেদিকে মানুষ ভ্রূক্ষেপও করে না। চিন্তা করুন, যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করত, তবে কেউ হয়ত সকাল আটটায়, কেউ দুপুর বারটায়, কেউ বিকাল চারটায় এবং কেউ রাতের বিভিন্ন অংশে ঘুমাবার ইচ্ছা করত! ফলে দিবা-রাত্রি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অহরহ মানুষ কাজ-কারবার ও শ্রমে লিপ্ত থাকত এবং মিল-ফ্যাক্টরী সর্বক্ষণ চালু থাকত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে নিদ্রিতদের নিদ্রায় এবং কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটত। কেননা কর্মীদের হট্টগোলে নিদ্রিতদের নিদ্রা ভেঙে যেত এবং নিদ্রিতদের অনুপস্থিতি কর্মীদের কাজ বিঘ্নিত করত। এ ছাড়া নিদ্রিতদের এমন সব অনেক কাজ বাদ পড়ে যেত, যা নিদ্রার সময়ই হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি শুধু মানুষের উপরই নয়---প্রত্যেক প্রাণীর উপর রাত্রিবেলায় নিদ্রাকে এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছে যে, সবাই কাজকর্ম ছেড়ে ঘুমাতে বাধ্য। সন্ধ্যার সাথে সাথেই যাবতীয় পশু-পাখী ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু নিজ নিজ বাসস্থান ও গৃহের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে কাজ ছেড়ে বিশ্রামের চিন্তা করে। সমগ্র বিশ্বে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও বিশ্রামে সাহায্য করে। কেননা অধিক আলোতে স্বভাবতই সুনিদ্রা আসে না।

চিন্তা করুন, যদি সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও জনগণ আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে নিদ্রার কোন সময় নির্দিষ্ট করতে চাইত, তবে প্রথমত তাতে কত যে অসুবিধা দেখা দিত তার ইয়ত্তা

নেই। দ্বিতীয়ত সব মানুষ যদি কোন চুক্তি অনুসরণ করে নিদ্রা যেত, তবে জন্তু-জানোয়ারকে কে চুক্তি অনুসরণে বাধ্য করতে পারত। তারা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করত এবং নিদ্রিত মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র ত ছনছ করে ফেলত। আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিই বাধ্যতা-মূলকভাবে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের উপর নির্দিষ্ট এক সময়ে নিদ্রা চাপিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিয়েছে। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

**সৌর ও চান্দ্র হিসাব ঃ** বলা হয়েছে ঃ حُسْبَانٌ—وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا

একটি ধাতু। এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীন রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বছর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতিবিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতিবিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকব্জা মেরামতের জন্য কোন ওয়ার্ক-শপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে ঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ—

হাজারো বছরে এদের গতিতে এক সেকেণ্ড পার্থক্য হয় না। পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার বিরতি দেখা যেত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা রয়েছে। কিন্তু اے روشنی طبع تو بر من بلا شدی (হে মনের ঔজ্জ্বল্য! তুমি আমার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছ।) এসব গোলকের অপরিবর্তনীয় ও অটল ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকে হতচকিত ও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে দিয়েছে। ফলে মানুষ একথা ভুলে গেছে যে, کوئی محبوب ہے اس پردۂ زنگاری میں (এ রঙিন পর্দার অন্তরালে কোন প্রেমাস্পদ রয়েছে) ঐশী গ্রন্থ, পয়গম্বর ও রসূলরা এ সত্য উদ্‌ঘাটন করার জন্যই অবতীর্ণ হন।

কোরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং এ দুটিই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলামী বিধি-বিধানে চান্দ্র মাস ও বছর ব্যবহার করা হয়েছে।

যেহেতু ইসলামী তারিখ এবং ইসলামী বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজন বশত সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেওয়া পাপের কারণ। এতে রমযান কিংবা যিলহজ্ব ও মহররম কবে হবে----তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা---যাতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না----একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃ-প্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানিক কল-কব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্ম-প্রবঞ্চিত।

آناں کہ بجز روئے تو جائے نگر انند
کوتہ نظر انند چہ کوتہ نظر انند

এরপর বলেছেন ঃ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহ্কে চেনে না, তারা বেখবর ও অচেতন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

مستقر—فمستقر و مستودع শব্দটি قرار থেকে উদ্ভূত। কোন বস্তুর অবস্থান স্থলকে مستقر বলা হয়। مستودع শব্দটি ودیعت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কারও কাছে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেওয়া। অতএব مستودع ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থান স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এ ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন ঃ مستودع ও مستقر যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন ঃ কবর ও পরলোক। এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কোরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাজী সানাউল্লাহ্ পানীপথী (র) তফসীর মাযহারীতে বলেছেন ঃ مستقر হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোযখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক, কিংবা কবর ও বরযখই হোক---সবগুলোই হচ্ছে مستودع অর্থাৎ সাময়িক অবস্থান-স্থল। কোরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لترکبن طبقا عن طبق----অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফির সদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়েও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে।

مسافر ہوں کہاں جانا ہے نا واقف ہوں منزل سے
ازل سے پھرتے پھرتے گور تک پہنچا ہوں مشکل سے

বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সৃষ্ট জগতের তামাশায় মত্ত হয়ে যারা আসল বাসস্থান এবং আল্লাহ্ ও পরকালকে ভুলে যায়, শেষ এ আয়াতে তাদের চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে---যাতে তারা প্রকৃত সত্য অনুধাবন করে এবং দুনিয়ার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পায়। মাওলানা জামী (র) চমৎকার বলেছেন ঃ

همه اندر زمن ترا زین است
که تو طفلی وخانه رنگین است

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ
اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾
وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ
لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

(৯৯) তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙুরের বাগান, যয়তুন-আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর—যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর—নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য। (১০০) তারা জ্বিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত, তাদের বর্ণনা থেকে। (১০১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে? অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। (১০২) ইনিই আল্লাহ্—তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আর তিনি ( আল্লাহ্ ) আকাশ থেকে ( অর্থাৎ আকাশের দিক থেকে ) পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি এ ( একই পানি ) দ্বারা রঙ-বেরঙের সর্বপ্রকার উদ্ভিদ ( মাটি থেকে )

উৎপন্ন করেছি, ( একই পানি ও মাটি থেকে এত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করা, যাদের রঙ, গন্ধ, স্বাদ ও উপকারিতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে, আল্লাহ্‌র কুদরতের কত বিস্ময়কর কারসাজি ! ) অতঃপর আমি এ ( কুঁড়ি ) থেকে ( যা প্রথমে মাটি ভেদ করে নির্গত হয় এবং হলদে রঙ হয় ) সবুজ শাখা বহির্গত করেছি---এ ( শাখা ) থেকে আমি উৎপাদন করি যুগম বীজ। ( এ হচ্ছে শস্যের অবস্থা فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى বাক্যে সংক্ষেপে তা উল্লিখিত হয়েছে। ) এবং খেজুরের কাঁদি থেকে ফলের গুচ্ছ বের করি, যা ( ফলভারে ) নিচে নুয়ে পড়ে এবং ( এ পানি দ্বারাই আমি ) আঙুরের বাগান ( উৎপন্ন করেছি ) এবং যয়তুন আনার ( বৃক্ষ উৎপন্ন করেছি ) যা ( কতক আনার ও কতক যয়তুন ফলের আকার আকৃতি, পরিমাণ ও রঙ ইত্যাদির দিক দিয়ে ) একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এবং ( কতক ) একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যহীন। প্রত্যেকটির ফলের প্রতি লক্ষ্য কর, যখন সেগুলো ফলন্ত হয় ( তখন সম্পূর্ণ কাঁচা, বিস্বাদ ও অব্যবহারযোগ্য হয় ) এবং ( অতঃপর ) এর পরিপক্কতা লক্ষ্য কর ( তখন সবগুণে পরিপূর্ণ হয়। এটিও আল্লাহ্‌র কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ) এ (গুলোর) মধ্যে (-ও একত্ববাদের ) প্রমাণাদি ( বিদ্যমান ) রয়েছে ---( প্রচারের দিক দিয়ে যদিও সবার জন্য, কিন্তু উপকৃত হওয়ার দিক দিয়ে ) তাদের ( -ই ) জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন ( -এবং চিন্তা ) করে। ( এ হচ্ছে ফল-মূলের বর্ণনা, যা সংক্ষেপে وَخَلَقَهُمْ বাক্যাংশে বর্ণিত হয়েছিল )।

এবং তারা ( মুশরিকরা স্বীয় বিশ্বাস মতে ) শয়তানদের ( সেই ) আল্লাহ্‌র ( যার গুণাবলী ও কর্ম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ) অংশীদার স্থির করে রেখেছে ( ফলে তাদের প্ররোচনায় তারা শিরক করে এবং আল্লাহ্‌র বিপরীতে তাদেরকে মেনে চলে )। অথচ তাদেরকে ( স্বয়ং তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও ) আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন ( যখন স্রষ্টা অন্য কেউ নয়, তখন উপাস্যও অন্য কেউ না হওয়া উচিত। ) এবং তারা ( কতক মুশরিক ) আল্লাহ্‌র জন্য ( স্বীয় বিশ্বাসে ) পুত্র ও কন্যা বিনা প্রমাণে গড়ে নিয়েছে [ যেমন খৃস্টানরা মসীহ্ (আ)-কে এবং কতক ইহুদী হযরত ওযায়ের (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যারূপে অভিহিত করত। ] তিনি পবিত্র ও সমুন্নত তাদের বর্ণনা থেকে----( অর্থাৎ তাঁর অংশীদার এবং পুত্র-কন্যা হওয়া থেকে ) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। ( অর্থাৎ নাস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং অন্য কোন আদি স্রষ্টা নেই। সুতরাং উপাস্যও অন্য কেউ হবে না। এতে অংশীদার না থাকা বোঝা গেল। সন্তান না থাকার প্রমাণ এই যে, সন্তানদের স্বরূপ তিনটি ঃ এক. স্বামী-স্ত্রী থাকা, দুই. উভয়ের মিলন এবং তিন. জীবিত বস্তু সৃষ্টি হওয়া। অতএব ) কিরূপে আল্লাহ্‌র সন্তান হতে পারে, যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই এবং তিনি ( যেমন তাদেরকে পয়দা করেছেন ঃ وَخَلَقَهُمْ এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ ---এমনি ভাবে ) তিনি সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং ( তিনি যেমন একক স্রষ্টা, তেমনি এ বিষয়েও তিনি একক যে, ) তিনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। ( আদি-অন্ত সবদিক দিয়েই। এ গুণেও

তাঁর কোন অংশীদার নেই। জ্ঞান ব্যতীত সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং এতদ্বারাও প্রমাণিত হল যে, অন্য কোন স্রষ্টা নেই।) ইনি (যার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে) আল্লাহ্—তোমাদের পালনকর্তা। তাঁকে ছাড়া আরাধনার যোগ্য কেউ নেই। সবকিছুর স্রষ্টা (যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এসব গুণ যখন আল্লাহ্‌র-ই,) অতএব তোমরা তাঁর (-ই) আরাধনা কর এবং তিনি (-ই) সবকিছুর সম্পাদনকারী। (অন্য কোন সম্পাদনকারীও নেই। সুতরাং তাঁর আরাধনা করলে তোমরা সত্যিকারভাবে উপকৃত হবে—অন্যে কি দেবে? মোট কথা, স্রষ্টাও তিনি, সর্বজ্ঞ তিনি এবং সম্পাদনকারীও তিনি। এ সবের দাবীও এই যে, উপাস্যও তিনিই হবেন)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অভিনব শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ এক. ঊর্ধ্বজগৎ, দুই. অধঃজগৎ এবং তিন. শূন্যজগৎ। অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ এক. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং দুই. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। সেমতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এর পর শূন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এর পর ঊর্ধ্বজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পুনঃ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণী বিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণী বিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে রাখা হয়েছে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ বিস্তারিত বর্ণনায় নিয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তাই منعم عليه যাদেরকে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বহাল রয়েছে ; অর্থাৎ শস্যের অবস্থা বীজ ও আঁটির বর্ণনার আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি ঊর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্য জগতের বস্তু।

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُمْ
بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا
أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ
عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾

(১০৩) কোন কিছুরই দৃষ্টিসীমা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না, অবশ্য তিনি সকলের দৃষ্টিকেই পেতে ও বেষ্টন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। (১০৪) তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। (১০৫) এমনিভাবে আমি নিদর্শনাবলী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি—যাতে তারা না বলে যে, আপনি তো এগুলো অধ্যয়ন করে বলছেন এবং যাতে আমি একে সুধীবৃন্দের জন্য খুব পরিব্যক্ত করে দেই। (১০৬) আপনি ঐ পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (১০৭) যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা শিরক করত না। আমি আপনাকে তাদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহীও নন।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

( তাঁর সর্বজ্ঞ হওয়া এবং এ গুণে একক হওয়া এরূপ যে, ) তাঁকে কারও দৃষ্টিসীমা বেষ্টন করতে পারে না—( ইহকালেও না এবং পরকালেও না। ইহকালে তাঁকে দর্শন করা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। শরীয়তের বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত। পরকালে বিভিন্ন প্রমাণ অনুযায়ী জান্নাতীরা যদিও তাঁকে দর্শন করবে, কিন্তু দৃষ্টি দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টন করা সম্ভব হবে না। যে দৃষ্ট বস্তুর বাহ্যিক অবস্থা দর্শনেন্দ্রীয় দ্বারা বেষ্টন করা অসম্ভব, তার অভ্যন্তরীণ স্বরূপ বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা বেষ্টন করা ততোধিক অসম্ভব। কেননা, বাহ্যিক অবস্থার চাইতে আভ্যন্তরীণ স্বরূপ অধিকতর সূক্ষ্ম এবং বিবেক-বুদ্ধিও দর্শনেন্দ্রিয়ের চাইতে অধিকতর ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত।) এবং তিনি ( অর্থাৎ আল্লাহ্ ) সকল দৃষ্টিকে ( সেগুলো তাঁকে বেষ্টন করতে অক্ষম, অবশ্যই ) বেষ্টন করেন। ( এমনিভাবে অন্যান্য

বস্তুকেও জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করেন----وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) এবং ( তিনি সবাইকে বেষ্টন করেন এবং তাঁকে কেউ বেষ্টন করে না---এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে,) তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। ( অন্য কেউ নয়। জ্ঞানের এ গুণে আল্লাহ্ তা'আলা একক। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, ) নিশ্চয় এবার তোমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে সত্য দর্শনের উপায়াদি ( অর্থাৎ একত্ববাদ ও রিসালতের যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি ) এসে গেছে। অতএব যে ( এগুলো দ্বারা সত্যকে ) প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজের উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজের ক্ষতি করবে এবং আমি তোমাদের ( অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্মের ) পর্যবেক্ষক নই। ( অর্থাৎ অশালীন কাজ করতে না দেওয়া যেমন পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব তদ্রূপ নয়। আমার কাজ শুধুমাত্র প্রচার করা।) এবং ( দেখ ) এমনি ( উত্তম )-রূপে আমি নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করি ( যাতে আপনি সবাইকে পৌঁছে দেন এবং ) যাতে তারা ( অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা বিদ্বেষবশত একথা ) না বলে যে, আপনি তো ( কারও কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু ) পড়ে নিয়েছেন। ( উদ্দেশ্য এই যে, যাতে তাদেরকে আরও জব্দ করা যায় যে, আমি তো এমন বিস্তারিতভাবে সত্যকে প্রমাণিত করতাম, পক্ষান্তরে তোমরা অর্থহীন বাহানা তালাশ করতে ) এবং যাতে আমি একে ( অর্থাৎ কোরআনের বিষয়বস্তুকে ) সুধী-বৃন্দের জন্য খুব পরিব্যক্ত করে দিই। ( অর্থাৎ কোরআন অবতারণের উপকার তিনটি ঃ এক. যাতে আপনি প্রচারকার্যের পুরস্কার লাভ করেন, দুই. যাতে অবিশ্বাসীরা অধিক অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং তিন. সুধীবৃন্দ ও সত্যান্বেষীদের সামনে সত্য ফুটে ওঠে। সুতরাং ) আপনি ( কে মানে, কে মানে না তা দেখবেন না বরং ) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে পথে চলার প্রত্যাদেশ হয়েছে, সে পথ অনুসরণ করুন ; ( এ পথে চলার জন্য এ বিশ্বাসই প্রধান যে, ) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নেই এবং ( এতে অটল থেকে ) মুশরিকদের প্রতি লক্ষ্য করবেন না ( যে, আফসোস, তারা ইসলাম গ্রহণ করল না কেন ? ) এবং ( লক্ষ্য না করার কারণ এই যে, ) যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা শিরক করত না ( কিন্তু তাদের দুষ্কর্মের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে সাজা দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। তাই এর কারণ সংগ্রহ করে দিয়েছেন এমতাবস্থায় আপনি এ চিন্তা করবেনই কেন ! ) আমি আপনাকে তাদের ( ক্রিয়াকর্মের ) তত্ত্বাবধায়ক করিনি এবং আপনি ( দুষ্কর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে ) ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। ( অতএব তাদের অপরাধসমূহের তদন্ত এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ভার যখন আপনাকে অর্পণ করা হয়নি, তখন আপনি উদ্বিগ্ন হবেন কেন ? )

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

আলোচ্য প্রথম আয়াতে ابصار শব্দটি بصر-এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি ادراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ স্থলে ادراك শব্দের অর্থ 'বেষ্টন করা' বর্ণনা করেছেন।---( বাহরে-মুহীত )

এতে আয়াতের অর্থ এই হয় যে জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীবজন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহ্‌র সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। এক. সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি এমনকি সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-র এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এ যাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়।---( মাযহারী )

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহ্ জীবজন্তুর দৃষ্টিকেও এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জন্তুর ক্ষুদ্রতম চক্ষুও পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ? এদের বিপরীতে পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্ব কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে?

تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے

( তুমি অন্তরে জাগরিত হও, বিবেকে ধরা দাও না। আমার বুঝতে বাকী নেই যে, এটাই তোমার পরিচয় )।

আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী অসীম। মানবিক ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও কল্পনা সসীম। এটা সবাই জানে যে, কোন অসীমকে কোন সসীম নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে না। তাই বিশ্বের যত বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক যুক্তিতর্কের নিরিখে স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলীর অনুসন্ধান ও গবেষণায় জীবনপাত করেছেন এবং যত সূফী মনীষী 'কাশফ' ( অন্তর্দৃষ্টি ) ও 'ইলহাম' ( ঐশী জ্ঞান )-এর আলো নিয়ে এ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি এবং পেতে পারে না। মওলানা রূমী (র) বলেন ঃ

دُور بینانِ بارگاہِ الست
غیر ازیں پے نہ بردہ اند کہ ہست

শেখ সাদী (র) বলেন ঃ

چہ شبہا نشستم دریں سیر گم
کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم

**স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা ঃ** মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পারে কি না, এ সম্পর্কে আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ) যখন رَبِّ أَرِنِي ( হে পরওয়ারদিগার, আমাকে দেখা দাও ) বলে আল্লাহ্কে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল ঃ لَنْ تَرَانِي ( তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না। ) হযরত মূসা (আ)-ই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জিন ও মানুষের সাধ্য কি ! তবে পরকালে মু'মিনরা আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ---কিয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাফির ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহ্কে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কোরআনের এক আয়াতে আছে ঃ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ—অর্থাৎ কাফিররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে আড়ালে ও বঞ্চিত থাকবে।

পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ ঘটবে---হাশরে অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌঁছার পরও। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্র সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নিয়ামত।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যেসব নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোন নিয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতীরা নিবেদন করবে ঃ ইয়া আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশী আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে হযরত সোহায়েব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

বোখারীর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ ( পরকালে ) তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

তিরমিযী ও মসনদে আহ্মদের এক হাদীসে ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে জান্নাতে মর্যাদা দান করবেন তাঁদেরকে প্রতি-দিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোট কথা, এ জগতে কেউ আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জান্নাতী এ নিয়ামত লাভ করবে! রসূলুল্লাহ্ (সা) মে'রাজের রাতে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগৎ বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপরে পরকালের স্থান। সেখানে পৌঁছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ — আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কিয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, আল্লাহ্কে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আয়াতের অর্থ এটা নয়, বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কিয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার মত শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে সর্বাবস্থায় দেখা হতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহ্র সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না।

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্র দ্বিতীয় গুণ যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পরিবেষ্টন-কারী। জগতের অণুকণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্ট জগত ও তাঁর অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারে না। কেননা, এটা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

এরপর ইরশাদ হয়েছে ঃ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ — আরবী অভিধানে لطيف শব্দটি দু' অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ এক. দয়ালু, দুই. সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না কিংবা জানা যায় না।

خبير শব্দের অর্থ, যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ সূক্ষ্ম। তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্ট জগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لطيف শব্দের অর্থ দয়ালু নেওয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও তাই সব গোনাহ্র কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بصائر শব্দটি بصيرت-এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান।

অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بصائر বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ কোরআন, রসূল (সা) ও বিভিন্ন মো'জেযা আগমন করেছে এবং তোমরা রসূলের চরিত্র, কাজকারবার ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজের উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। অর্থাৎ মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রসূল (সা)-এর দায়িত্ব নয়, যেমনটি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পৌঁছিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা, না করা মানুষের দায়িত্ব।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ ও রিসালতের যেসব প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণাদি বর্ণনা করে থাকি।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ—এর মর্ম এই যে, হিদায়েতের সব সাজ-সরঞ্জাম, মো'জেযা, অনুপম প্রমাণাদি---যেমন, কোরআন ---একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে---সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে-কোন হঠকারী অবিশ্বাসীরও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে دَرَسْتَ অর্থাৎ এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছে ঃ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ---এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোট কথা এই যে, হিদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনে রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এ দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথ-প্রদর্শক হয়ে গেছেন।

চতুর্থ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে ঃ কে মানে, আর কে মানে না---- আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন যা অনুসরণ করার জন্য পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না।

পঞ্চম আয়াতে এর কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শিরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেন নি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই উচিত।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ
لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا
لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾
وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ

وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

(১০৮) তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে। তাহলে তারাও ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌কে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত। (১০৯) তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে দিনঃ নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ! তোমাদের কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই? (১১০) আমি ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেব। (১১১) আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (১১২) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে চাকচিক্যময় কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন। (১১৩) যাতে চাকচিক্যময় বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয়, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে ঐসব কাজ করে, যা তারা করছে।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

আর তোমরা তাদের (অর্থাৎ সেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) গালি দিও না, তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌কে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তওহীদকে) উপেক্ষা করে যার উপাসনা করে। (যদি তোমরা এমন কর) তাহলে অজ্ঞতাবশত সীমালংঘন করে (অর্থাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে) তারা আল্লাহ্‌কে গালি দেবে। বস্তুত এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের যে সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া হয় না, সেজন্য বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, আমি (দুনিয়াতে তা) এমনিভাবে (যেমন হচ্ছে) সকল ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে তাদের কর্ম (ভাল হোক কিংবা মন্দ) সুশোভিত করে রেখেছি। (অর্থাৎ এমন সব কারণ সংঘটিত হয়ে যায়, যদ্দরুন প্রত্যেকের কাছে তার ধর্ম পছন্দনীয় মনে হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ জগৎ আসলেই একটি পরীক্ষা কেন্দ্র। কাজেই এখানে শাস্তি দেওয়া জরুরী নয়।) অতঃপর (অবশ্য যথাসময়ে) স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদের (সবাইকে) যেতে হবে। অনন্তর (তখন) তারা (দুনিয়াতে) যা কিছু করত, তিনি তা তাদেরকে বলে দেবেন (এবং অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবেন)। এবং তারা

(অবিশ্বাসীরা) স্বীয় কসমে খুব জোর দিয়ে আল্লাহ্‌র কসম খেয়েছে যে, যদি তাদের (অর্থাৎ আমাদের) কাছে তাদের প্রার্থিত (নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে) কোন নিদর্শন আসে, তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) অবশ্যই তৎপ্রতি (অর্থাৎ নিদর্শনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করবে। (অর্থাৎ নিদর্শন প্রকাশকারীর নবুয়ত মেনে নেবে।) আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ নিদর্শনাবলী সব আল্লাহ্‌র করায়ত্ত, (তিনি যে ভাবে ইচ্ছা, সেগুলো পরিচালনা করবেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ করা এবং ফরমায়েশ করা অন্যায়। কেননা, কোন্ নিদর্শনটি প্রকাশ হওয়া উপযুক্ত এবং কোন্‌টি প্রকাশ না হওয়া উপযুক্ত তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তবে পয়গম্বর প্রেরণের সময় কোন নিদর্শন প্রকাশ করা উপযুক্ত তা নিশ্চিত। আল্লাহ্ তা'আলা রিসালতে মুহাম্মদীর সত্যতার অনেক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন। এগুলোই যথেষ্ট। এ হচ্ছে তাদের ফরমায়েশের জওয়াব।) এবং (মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, এসব নিদর্শন প্রকাশ হলে ভালই হয়। এতে সম্ভবত তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। তাই মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে,) তোমরা কি খবর রাখ (বরং আমি খবর রাখি) যে, তারা (ফরমায়েশী) নিদর্শন যখন আসবে (চরম শত্রুতাবশত) তখনও বিশ্বাস স্থাপন করবে না এবং (তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে) আমিও তাদের অন্তরকে (সত্যান্বেষণের ইচ্ছা থেকে) এবং তাদের দৃষ্টিকে (সত্য দর্শন থেকে) ঘুরিয়ে দেব। (আর তাদের এ বিশ্বাস স্থাপন না করা এমন) যেমন তারা এর (অর্থাৎ কোরআনের) প্রতি (যা একটি বিরাট মো'জেযা) প্রথমবার (যখন আগমন করেছিল) বিশ্বাস স্থাপন করেনি। (কাজেই এখন বিশ্বাস না করাকে অসম্ভব মনে করো না) এবং (تقليب ابصار অর্থাৎ দৃষ্টিকে অকেজো করে দেওয়ার অর্থ বাহ্যিক تقليب নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে,) আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় (ও কুফরে) উদ্‌ভ্রান্ত (অস্থির) থাকতে দেব, (বিশ্বাস স্থাপনের তৌফিক হবে না। এটা অভ্যন্তরীণ تقليب) এবং (তাদের হঠকারিতা এরূপ যে,) আমি যদি (একটি নয়, কয়েকটি এবং বিরাট বিরাট ফরমায়েশী নিদর্শনও প্রকাশ করতাম; উদাহরণত) তাদের কাছে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতাম (যেমন তারা বলে ঃ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ) এবং তাদের সাথে মৃতরা (জীবিত হয়ে) কথাবার্তা বলত (যেমন তারা বলে ঃ فَاْتُوْا بِاٰبَائِنَا) এবং (তারা তো শুধু এতটুকুই বলে যে, تَاْتِىْ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيْلًا) আমি (এতটুকুতে ক্ষান্ত হতাম না বরং) সমস্ত (অদৃশ্য) বিষয়কে (জান্নাত, দোযখ ইত্যাদি সহ) তাদের কাছে তাদের চোখের সামনে এনে একত্র করতাম, (যে, তারা খোলাখুলি দেখে নিত) তবুও তারা কস্মিনকালেও বিশ্বাস স্থাপন করত না,

কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান ( এবং তাদের বিধিলিপি পরিবর্তন করে দেন, ) তবে ভিন্ন কথা। ( অতএব তাদের হঠকারিতা ও দুষ্টামির অবস্থা যখন এই এবং তারা নিজেরাও তা জানে যে, কখনও তাদের বিশ্বাস স্থাপন করার ইচ্ছা নেই, তখন নিষ্ফল হওয়ার কারণে নিদর্শনাবলীর ফরমায়েশ না করাই সঙ্গত ছিল ) কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খতা করছে ( যে, বিশ্বাস স্থাপনের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনর্থক ফরমায়েশ করে চলছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ মূর্খতা ) এবং ( তারা যে আপনার সাথে শত্রুতা করে---এটা নতুন কিংবা আপনার ব্যাপারেই নয় ; বরং তারা আপনার সাথে যেমন শত্রুতা করে ) এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রুরূপে অনেক শয়তান সৃষ্টি করেছিলাম---কিছু মানব ( যাদের সাথে তাদের আসল কাজকর্ম ছিল ) এবং কিছু জিন ( ইবলীস ও তার বংশধর ) তন্মধ্যে কেউ কেউ ( অর্থাৎ ইবলীস ও তার বাহিনী ) অন্য কিছু সংখ্যককে ( অর্থাৎ কাফির মানুষের মনে ) মুখরোচক বিষয়ের ওয়াসওয়াসা প্রদান করত প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে। ( অর্থাৎ কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা যা বাহ্যত পছন্দনীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল মারাত্মক একটা প্রতারণা। যখন এটা নতুন নয়, তখন এ জন্য দুঃখ করবেন না যে, তারা আপনার সাথে এরূপ ব্যবহার কেন করে! আসলে এতে কিছু রহস্যও রয়েছে। তাই তাদের এসব কাজ করার সামর্থ্যও হয়ে গেছে ) এবং আল্লাহ্ যদি ( এরূপ ) চাইতেন ,( যে, তারা এরূপ কাজ করতে সমর্থ না হোক, ) তবে তারা এরূপ কাজ করতে পারত না। ( কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে তাদেরকে এ সামর্থ্য দান করা হয়েছে। ) অতএব ( যখন এতে এ উপকারিতা রয়েছে, তখন ) তাদেরকে এবং তাদের ( ধর্ম সম্পর্কে ) মিথ্যাপবাদ রটনাকে আপনি ছেড়ে দিন ( এ চিন্তায় পড়বেন না। আমি স্বয়ং নির্দিষ্ট সময়ে এর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করব। উপরোক্ত রহস্য ও প্রজ্ঞাসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম )। এবং ( শয়তানরা কাফিরদের এজন্য কুমন্ত্রণায় নিক্ষেপ করত ) যাতে এর প্রতি ( অর্থাৎ প্রতারণামূলক বাক্যের প্রতি ) তাদের অন্তর আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে ( যথোপযুক্ত ) বিশ্বাস করে না। ( উদ্দেশ্য, কাফির সম্প্রদায় ; যদিও তারা আহলে-কিতাব, কেননা তারাও পরকালে যথোপযুক্ত বিশ্বাস করে না। যদি করত তবে নবুয়ত অস্বীকার করার দুঃসাহস করত না। কেননা, তজ্জন্য কিয়ামতে শাস্তি প্রদান করা হবে। ) এবং যাতে ( অন্তর আকৃষ্ট হওয়ার পর ) তাকে ( আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারাও ) পছন্দ করে নেয় এবং যাতে ( বিশ্বাসের পর ) ঐসব কাজ ( -ও ) করতে থাকে, যা তারা করত।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাস'আলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নযুল এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পিতৃব্য আবূ তালিব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা মহা ফাঁপরে পড়ে যায়। তারা পারস্পরিক বলাবলি করতে থাকে ঃ আবূ তালিবের মৃত্যু আমাদের জন্য কঠিন

সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থী হবে। লোকে বলবে ঃ আবূ তালিব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবূ তালিবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নিই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবূ তালিব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রুদের মোকাবিলায় সব সময় তাঁর ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কোরায়েশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবূ তালিবের কাছে যাওয়ার জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হল। আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহল, আমর ইবনে আস প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সে আবূ তালিবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধিদলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবূ তালিবকে বলল ঃ আপনি আমাদের মান্যবর সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদের মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা উপাস্য করবেন; আমরা কিছুই বলব না।

আবূ তালিব রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাছে ডেকে বললেন ঃ এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আপনারা কি চান ? তারা বলল ঃ আমাদের বাসনা, আপনি আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে ?

আবূ জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ঃ এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি ? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্। একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবূ তালিবও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কলেমা ছাড়া অন্য কোন কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কলেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ চাচাজান, আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য কোন কলেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়,

তবুও আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কোরায়েশ সর্দারদের নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল ঃ হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদের মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকে গালি দেব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রসূল বলে দাবী করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ আপনি ঐ প্রতিমাদের মন্দ বলবেন না, যাদের তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহ্‌কে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে।

এখানে لَا تَسُبُّوا শব্দটি سب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গালি দেওয়া।

রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশব কালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনও গালি দেন নি। সম্ভবত কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কোরায়েশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদের গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরাও আপনার আল্লাহ্‌কে গালিগালাজ করব।

এতে কোরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল ; যেমন বলা হয়েছে ঃ

مَا جَعَلْنٰكَ—أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ—اتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ এবং عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ----এসব বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছিল, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে لَا تَسُبُّوا বলা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তো কখনও কাউকে গালি দেন নি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করলে তা তাঁর মনোকষ্টের কারণ হতে পারে। তাই ব্যাপক সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে-কিরামও এ ব্যাপারে সাধারণ হয়ে যান।---( বাহ্‌রে মুহীত )

এখন প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের

কথা আলোচনা করা হয়েছে। অথচ এসব আয়াত রহিত নয়; অদ্যাবধি এগুলো তিলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই—কোরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসাবে কোন সত্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদের মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষায় বিশেষ বাকপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনও কোন বিষয়ের তথ্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণত আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কোরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতাও ফুটে ওঠে। বলা হয়েছে ঃ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ—অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা---সবাই জাহান্নামের ইন্ধন।

এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়—পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফিকহ্‌বিদরা বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নাজায়েয হবে। যেমন মকরূহ স্থানসমূহে কোরআন তিলাওয়াত যে নাজায়েয তা সবাই জানে।---(রূহুল-মা'আনী)

মোট কথা, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে এবং কোরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোন বাক্য উচ্চারিত হয়নি, যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশংকা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা এবং এ সম্পর্কিত কোরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়েছে।

**কোন পাপের কারণ হওয়াও পাপ ঃ** উদাহরণত একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে

যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ এবং কোন-না-কোন স্তরে প্রশংসনীয় হয় কিন্তু সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদের মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবত মূলত তা সওয়াব এবং প্রশংসনীয়ও বটে কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশংকা দেখা দেয় যে, প্রতিমা পূজারীরা আল্লাহ্ তা'আলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদের মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত রয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ জাহিলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কোরায়েশরা তার পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহিমী ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমত কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশ-বিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত কা'বাগৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাহিলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটিমাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে, যাতে কা'বাগৃহে প্রবেশ তাদের ইচ্ছানুযায়ী হতে পারে; প্রত্যেকেই যেন বিনা বাধায় প্রবেশ করতে না পারে। রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বাগৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণ-রূপে ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দিই। কিন্তু আশংকা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবি রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বাগৃহকে ইবরাহিমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি ইবাদত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশংকা আঁচ করে রসূলুল্লাহ্ (সা) এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতি জানা গেল যে, কোন বৈধ বরং সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবূ মনসূর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কাফির নিধন ফরয করেছে। অথচ কাফির নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল এই যে, কোন মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করলে কাফিররাও মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কোরআন তিলাওয়াত, আযান ও নামাযের প্রতি অনেক কাফির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজেদের ইবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবূ মনসুর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরী শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার

কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়। যেমন মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বাগৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যদ্দূর সম্ভব অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী (র) ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র) উভয়েই এক জানাযার নামাযে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নিকটে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র) সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র) বললেন ঃ জনসাধারণের ভ্রান্ত কর্মপন্থার কারণে আমরা জরুরী কাজ কিভাবে ত্যাগ করতে পারি ? জানাযার নামায ফরয। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এ ঘটনাটিও রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তার বৈধ বরং ইবাদত, কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে ফাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাজটি শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফিকহ্‌বিদরা হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোন কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে---যদ্দরুন তার কঠোর গোনাহ্‌গার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন ঃ অমুক কাজটি করলে খুবই ভাল হত। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গোনাহ্‌ পুত্রের উপর বর্তাবে না।---( খোলাসাতুল ফাতাওয়া )

এমনিভাবে কাউকে ওয়াজ-উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন কুকাণ্ড করে বসবে যদ্দরুন আরও অধিকতর গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বোখারী (র) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন ঃ

باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس فيقعوا فى اشد منه ـ

অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্য পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোন ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়।

কিন্তু যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত---ফরয, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ অথবা অন্য কোন প্রকার ইসলামী বৈশিষ্ট্য হবে---তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনও ত্যাগ করা যাবে না। বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝি ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, নামায, কোরআন তিলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফিররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামী বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুলে বর্ণিত আবূ জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, কোরায়েশ সর্দাররা তওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয় তবুও আমি তওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না।

তাই এ মাস'আলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যা ত্যাগ করলে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশংকার কারণে পরিত্যাগ করা যাবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুস্পষ্ট মো'জেযা ও আল্লাহ্ তা'আলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও হঠকারী লোকেরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং নিজেদের অস্বীকৃতি ও জেদের উপর অটল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বিশেষ বিশেষ ধরনের মো'জেযা দাবী করেছে; যেমন ইবনে জরীর (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী কোরায়েশ সর্দাররা দাবী উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মো'জেযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার নবুয়ত মেনে নেব এবং মুসলমান হয়ে যাব।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মো'জেযা প্রকাশ পায় তবে তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করার জন্য দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষুণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেব। কিন্তু আল্লাহ্র আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব নাযিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন মো'জেযা দাবী করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্র গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে। দয়ার সাগর রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত

ছিলেন! তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন ঃ এখন আমি এ মো'জযার দোয়া করব না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ এতে কাফিরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মো'জেযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্য শপথ করল। এর পরবর্তী إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মো'জেযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। যেসব মো'জেযা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মো'জেযা দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা) রিসালতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মো'জেযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবী করা, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; যেমন আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই দাবী করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নেব। বাদীর এ উদ্ভট দাবীর প্রতি কোন আদালতই কর্ণপাত করবে না।

এমনিভাবে নবুয়ত ও রিসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মো'জেযা প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মো'জেযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব।

এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদের সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে যে, নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরের কাছে তা শুদ্ধরূপে পৌঁছিয়ে দেওয়াই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘামানো উচিত নয়। কেননা, জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়! যদি তা উদ্দেশ্য হত, তবে আল্লাহ্‌র চাইতে শক্তিশালী কে? তিনি নিজেই সবাইকে মুসলমান করে দিতে সক্ষম। এসব আয়াতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দান করার জন্য আরও বলা হয়েছে যে, আমি যদি তাদের প্রার্থিত মো'জেযাসমূহও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিই, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তাদের অস্বীকৃতি কোন ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে। কোন মো'জেযা দ্বারা এর প্রতিকার হবার নয়। সবশেষে وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মো'জেযাসমূহ দেখিয়ে দিই; বরং এর চাইতেও বেশী ---ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দিই, তবুও তারা মানবে না। পরবর্তী দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয়

নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। অতএব আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ
مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

**(১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন! আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি সংশয় প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১১৫) আপনার পালনকর্তার বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুসমন্বিতভাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১১৬) আর আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে! তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। (১১৭) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তাঁর পথে অনুগমন করে।**

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

( আপনি বলে দিন ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালতে মতবিরোধ সম্পর্কিত যে ব্যাপার রয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে আমি যার দাবীদার এবং তোমরা তার অবিশ্বাসী —এ বিষয়ের ফয়সালা শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এভাবে হয়ে গেছে যে, তিনি আমার দাবীর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ কোরআন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এরপরও মেনে নিচ্ছ না।) তবে কি (তোমরা চাও যে, আমি আল্লাহ্র এ ফয়সালাকে যথেষ্ট মনে না করি এবং) আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ফয়সালাকারী

অনুসন্ধান করি? অথচ তিনি এমন (পূর্ণ ফয়সালা করেছেন) যে, একটি গ্রন্থ (যা স্বীয় অলৌকিকতায়) স্বয়ংসম্পূর্ণ, তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। (এটি স্বীয় অলৌকিকতার কারণে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব অলৌকিকতা ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া---এ দু'টি হচ্ছে এর পূর্ণতা। এছাড়া অন্যান্য দিক দিয়েও এটি পূর্ণ। আর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং হিদায়ত ও শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর জন্য যথেষ্ট। সেমতে) এর (পূর্ণতার তৃতীয় এক) অবস্থা এই যে, (ধর্মীয় ক্ষেত্রে) এর (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়বস্তুসমূহ খুব বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আর (এর পূর্ণতার চতুর্থ অবস্থা এই যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে এর আগাম সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। এটি এর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারই লক্ষণ। সেমতে) আমি যাদেরকে গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জীল) দান করেছি, তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটি (অর্থাৎ কোরআন) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাস্তব সত্যসহ প্রেরিত হয়েছে। (একথা সবাই জানে যে, এটা সত্য। কিন্তু এরপরেও যারা সত্যভাষী ছিল, তারাই তা প্রকাশ করেছে, যারা হঠকারী ছিল, তারা প্রকাশ করেনি।) অতএব আপনি সংশয়-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (পূর্ণতার পঞ্চম অবস্থা এই যে,) আপনার পালনকর্তার (এ) কালাম সত্য ও সুষম হওয়ার দিক দিয়ে (-ও) সম্পূর্ণ। (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সত্যতা এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সমতা এর মধ্যে নিহিত। পূর্ণতার ষষ্ঠ অবস্থা এই যে,) তাঁর (এ) কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই (অর্থাৎ কারও পরিবর্তন ও বিকৃতকরণের ব্যাপারে আল্লাহ্ এর সংরক্ষক--- وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) বস্তুত (এমন পূর্ণ প্রমাণ পেয়েও যারা মুখে ও অন্তরে এর প্রতি মিথ্যারোপ করে) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের কথাবার্তা) শ্রবণ করেছেন (এবং তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে) খুব ভাল করেই জানেন (সময় হলে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন)। আর (সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও) পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এমনি (অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট রয়েছে) যে, যদি (ধরে নিন) আপনি তাদের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র (সরল) পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে, (কেননা, তারা নিজেরাও বিপথগামী। সেমতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) তারা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনারই অনুসরণ করে এবং (কথাবার্তায়) সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা বলে। (আর তাদের বিপরীতে আল্লাহ্‌র কিছু সংখ্যক বান্দা সরল পথেও রয়েছেন। আর) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদেরকে (-ও) খুব ভাল জানেন, যারা তার (প্রদর্শিত সরল) পথ থেকে বিপথগামী হয়। আর তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তার (প্রদর্শিত) পথের অনুসরণ করে (অতএব, বিপথগামীরা শাস্তি পাবে এবং সরল পথের অনুসারীরা পুরস্কৃত হবে)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোর-আনের সত্য ও অভ্রান্ত হওয়ার পক্ষে খোলাখুলি মো'জেযা ও প্রমাণাদি দেখা ও জানা সত্ত্বেও হঠকারিতাবশত বিশেষ বিশেষ ধরনের মো'জেযা প্রদর্শনের দাবী করে। কোরআন পাক তাদের বক্র দাবীর উত্তরে বলেছে যে, তারা যে সব মো'জেযা এখন দেখতে চায়, সেগুলো

প্রকাশ করাও আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু হঠকারীরা এগুলো দেখার পরও অবাধ্যতা পরিহার করবে না। আল্লাহ্‌র চিরাচরিত আইনানুসারে অতঃপর এর ফলশ্রুতি হবে এই যে, সবাইকে আযাব গ্রাস করে নেবে।

এ কারণেই দয়ার সাগর রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রার্থিত মো'জেযা প্রকাশ করতে দয়াবশত অস্বীকার করেন এবং যেসব মো'জেযা এ যাবত তাদের সামনে এসে গিয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তাদেরকে আহবান জানিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাক সত্য এবং আল্লাহ্‌র কালাম।

প্রথম আয়াতের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালত ও নবুয়তে মতবিরোধ সম্পর্কিত ব্যাপার বিদ্যমান। আমি রিসালতের দাবীদার এবং তোমরা অবিশ্বাসী। শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে আমার পক্ষে এ বিষয়ের ফয়সালা এভাবে দেওয়া হয়ে গেছে যে, আমার দাবীর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি হচ্ছে স্বয়ং কোরআনের অলৌকিকতা। কোরআন বিশ্বের সকল জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, এটি আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ার ব্যাপারে যদি কারও সন্দেহ থাকে তবে সে এ কালামের একটি ছোট সূরা কিংবা আয়াতের অনুরূপ সূরা কিংবা আয়াত উপস্থিত করে দেখাক। এ চ্যালেঞ্জের জওয়াবে সমগ্র আরব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, সন্তান-সন্ততি, ইযযত-আবরূ সবকিছু কুরবান করেছিল, তাদের মধ্য থেকে একটি লোকও এমন বের হল না, যে কোরআনের মোকাবিলায় দু'টি আয়াতও রচনা করে দেখিয়ে দিতে পারে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, যিনি কোথাও কারও কাছে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নি---তিনি এমন বিস্ময়কর কালাম জনসমক্ষে পেশ করলেন, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব বরং সমগ্র বিশ্ব অক্ষম হয়ে পড়েছে। সত্য গ্রহণের জন্য এ খোলাখুলি মো'জেযাটি যথেষ্ট ছিল না কি? এটি প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ফয়সালা যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র সত্য রসূল এবং কোরআন আল্লাহ্‌র সত্য কালাম।

প্রথম আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا—অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কোরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কোরআনের সত্যতা এবং আল্লাহ্‌র কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا— এতে কোরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ এক. কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। দুই. এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ---এর মোকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম।

তিন. যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। চার. পূর্ববর্তী আহলে-কিতাব ইহুদী ও খৃস্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কোরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ — অর্থাৎ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না। যেমন স্বয়ং তিনি বলেন ঃ আমি কোন সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি---( ইবনে-কাসীর ) এতে বোঝা গেল যে, এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোককে শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, তখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে ?

দ্বিতীয় আয়াতে কোরআন পাকের আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কোরআন পাক যে আল্লাহ্‌র কালাম-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ — অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।

تَمَّتْ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كَلِمَتُ رَبِّكَ বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে।---( বাহ্‌রে-মুহীত ) কোরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার। এক. যাতে বিশ্ব-ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সৎ কাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং দুই. যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ দুই প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোরআন পাকের صِدْقًا وَعَدْلًا ——দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। صدق-এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে। অর্থাৎ কোরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরূপ ভ্রান্তির আশংকা নেই। عدل -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সব বিধান عدل তথা ন্যায়বিচারভিত্তিক। عدل শব্দের দুটি অর্থ ঃ এক. ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা না হয়। দুই. সমতা ও সুষমতা।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই, যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন না। আলোচ্য আয়াতে تَمَّتْ শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কোরআনে শুধু صدق وعدل বিদ্যমানই নয়, বরং কোরআন এ সব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কোরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক---একথাটি একমাত্র আল্লাহ্ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোন আইনসভা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোন আইন রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতার পরিপন্থী দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক উর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কোরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি (অর্থাৎ কোরআনের বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য, এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই। কোরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লংঘন নেই।) কোরআন যে আল্লাহ্‌র কালাম ---তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কোরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ — অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোন ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহর কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনেরই উর্ধ্বে। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? কোরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের